SHAHID MATANGINI HAZRA GOVT GENERAL DEGREE COLLEGE FOR WOMEN

ESTD 2015

সৃজনী

২০২২-২৩

SRIJANI

2022-23

শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ফর উইমেন

তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষ

ডিসেম্বর ২০২২

SHAHID MATANGINI HAZRA GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE FOR WOMEN

CHAKSHRIKRISHNAPUR, KULBERIA, PURBA MEDINIPUR, PIN: 721649

CONTACT NO.: 03228 262 262

অধ্যক্ষের কলমে

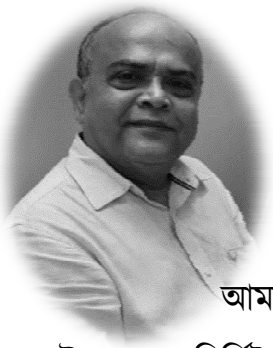

আমাদের কলেজের বার্ষিক পত্রিকা ‘সৃজনী’ প্রকাশিত হল। গত দু-বছরের মতোই আমরা নির্দিষ্ট সময়ে এই সারস্বত প্রয়াসকে পাঠকের দরবারে হাজির করতে পেরেছি। আশা করি ভবিষ্যতেও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

‘স্বাধীনতার ৭৫’ এবছর আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। যাপিত জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে আমরা পড়তে চেয়েছি স্বদেশ ও স্বাধীনতাকে। সেইসঙ্গে অনিবার্যভাবেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নারীবিশ্বের নানা কথন। এছাড়া, গল্প-কবিতা-গদ্য-প্রবন্ধ-ছবি ইত্যাদি মিলে গড়ে তুলেছে এই স্বপ্নময় প্রকল্পটিকে।

‘সৃজনী’-র প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকলকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। এই সংখ্যায় সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করেছে বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক দেবায়ন চৌধুরী। তার প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। যেসমস্ত ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী তাঁদের ভাবনা দিয়ে পরিপূর্ণ করে তুললেন এই অক্ষর-আয়োজন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আশা রাখি, সৃজনী হয়ে উঠবে আমাদের অস্তিত্বের অন্যতম আয়না।
সকলে ভালো থাকুন। ইংরেজি নববর্ষের অগ্রিম শুভেচ্ছা রইল।

ডিসেম্বর ২৮, ২০২২

ড. বিজয় কৃষ্ণ রায়
অধ্যক্ষ
শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ফর উইমেন
নিমতৌড়ি, পূর্ব মেদিনীপুর

Organizational Structure

The members of the committee are:

Dr. Bijoy Krishna Roy - Principal

Yasmin Chaudhuri, Assistant Professor in English – Advisor/ Editor

Aparupa Banerjee, Assistant Professor in Geology – Advisor

Debayan Chaudhuri, Assistant Professor in Bengali – Coordinator/ Editor

Sachinath Bera, Assistant Professor in Chemistry – Member/Editor

Piyasi Biswas, Assistant Professor in Physics – Member/ Editor

Manoj Kumar Barman, Assistant Professor in Sanskrit – Member

Sayantika Sen, Assistant Professor in English – Member

Sayanwita Panja, Assistant Professor in Chemistry – Member

Enakshi Das, Assistant Professor in Geology – Member

Subrata Das, Assistant Professor in Bengali – Member

Parna Roy, Assistant Professor in Physics – Member

Priya Sikdar, Assistant Professor in Philosophy – Member

Contents/সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
75 years of Independence : স্বাধীনতার ৭৫		8-15
স্বাধীনতা ৭৫ : প্রাপ্তি, প্রত্যাশা এবং প্রতিশ্রুতি	পিকু দাশগুপ্ত	9
স্বাধীনতার ৭৫ ও আজকের ভারত	সায়ন্তনী গুছাইত	13
Insightful Gems : অন্তরে অন্দরে		16-31
নারীবাদের সহজপাঠ	সৌতি বসু	17
অবহেলিত ও অত্যাচারিত নারীসমাজ	অন্বেষা মান্না	21
Indian Women and Independence	Yasmin Chaudhuri	24
নারী	পারমিতা বেরা	28
দুর্গাপূজার অঙ্গে কুমারী পূজা	সোমা মাইতি	29
Revelations : উৎসারিত আলো		32-37
দ্রৌপদী মুর্মু : এক অনন্য নারীশক্তির প্রতীক	অতসী মহাপাত্র	33
Mirror of Life : আয়নামহল		38-42
'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে'	রঞ্জনা গাঙ্গুলী (মুখার্জী)	39
জীবনস্মৃতি	রত্না মাইতি	41
Writing the Self : আত্মকথা		43-50
আমাদের মেয়েদের প্রতি	ইনা ধর রায় দাশগুপ্ত	44
গুরুপ্রণাম	পায়েল দোলাই	46
হৃদয়ের ক্যানভাসে স্মৃতির পাতা	সাহিন বানু	48
একটি ল্যাম্পপোস্টের আত্মকথা	মীনাক্ষী সামন্ত	49
একমাত্র	দেবায়ন চৌধুরী	50
Creative Bytes : ছোটোগল্প		51-65
ওখানে যাওয়া মানা	কাবেরী গুড়িয়া	52
নতুন দিশা	দীপান্বিতা সামন্ত	55
COCONUT	Aytihya Das	58
আলোর স্বপ্ন	সুপর্ণা সামন্ত	61
মধ্যবিত্ত ছেলে	শ্রেয়া আদক	63
নতুন জীবন	টগরী বিন্দাই	63
লটারি	মহীতোষ ভৌমিক	64

Wings of Poesy : কাব্যশিল্পপঙ্খ		66-78
A New Dawn	Aditi Jana	67
বিদ্যালয়ের শিক্ষাগুরু	সাহিদা সুলতানা	68
আবেশ	মামনি মিশ্র পাণ্ডা	68
কথকতা	সপ্তর্ষি পাত্র	69
ভালোবাসি মা	সুস্মিতা পাল	69
নারী	অর্পিতা সিংহ	69
ফিরে পাওয়ার আশা	লিলি দাস	70
কালো মেয়ে	তনুশ্রী ঘোড়ই	70
স্মৃতি	বাণী মাঝি	70
স্বাধীনতার মানে	প্রিয়াঙ্কা বর্মন	71
আগমনী দুর্গা	অর্পিতা বর্মন	71
সর্বজয়া নারী	সুদীপ্তা দাস	71
শিক্ষক-শিক্ষিকা	সুস্মিতা বেরা	72
নারীর স্বাধীনতা	পম্পা মান্না	72
বিদায় বেলায়	শিল্পা সামন্ত	72
বাবা	রাজশ্রী ভৌমিক	73
দুঃসময়	পূজা রানী কুইল্যা	73
জীবন	অঙ্কনা প্রধান	74
আগমনী	সুস্মিতা খাটুয়া	74
আলোর প্রসাদ	সমন্বিতা ভীম	74
বন্ধু	শ্রাবণী দাস	74
সবুজে ঘেরা পৃথিবীটা	জয়শ্রী ভক্তা	75
কন্যাশ্রী	সুনেত্রা ভৌমিক	75
আমি গর্বিত আমি নারী	সৌমিতা মিশ্র	75
পাথরকুচি	কাকলি ঘোড়াই	76
চাওয়া পাওয়া	অন্তরা ব্যানার্জী	77
শারদীয়া	মধুরিমা চৌধুরী	77
আমাদের ঋতুবৈচিত্র	পিঙ্কি পাত্র	78
Pearls of Wisdom/জ্ঞানের মণিমুক্তো		79-82
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের দ্বারা আধুনিক রোগের উপশমের উপায়ের বিশ্লেষণ	দেবব্রত বেরা	80

Science Safari : বিজ্ঞান অন্বেষা		83-91
The Chemistry of Fire	Sadaf Rifa Khan	84
Types of Stars	Mahadeb Pal	89
Key to Success : সাফল্যের চাবিকাঠি		92-106
The Key to Academic Success : Practical Advice for Students	Yasmin Chaudhuri	93
স্নাতকের পর কী করবে	পর্ণা রায়	96
Future aspects of Opto-electronics and Photonics	Sayan Bag	98
Navigating the Path to Success : Career Tips for Students	Yasmin Chaudhuri	101
হাল ছেড়ো না	শচীনাথ বেরা	105
In Focus : ছবির জগৎ		107-112
Colours and Quils : রেখায় রঙে		113-119
Fun with Puzzles : শব্দ নিয়ে খেলা		120-122
শব্দছক, শব্দজব্দ	অপরূপা ব্যানার্জী	121
Editorial Policy		123

75 Years of Independence

স্বাধীনতার ৭৫

স্বাধীনতার ৭৫ : প্রাপ্তি, প্রত্যাশা এবং প্রতিশ্রুতি

পিকু দাশগুপ্ত, সহযোগী অধ্যাপিকা
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

স্বাধীনতার ৭৫ বছর সম্পূর্ণ। স্বাধীন ভারত গণতন্ত্রে, প্রজাতন্ত্রে এবং অবশ্যই ধর্ম নিরপেক্ষতায় আজও এক এবং অনন্য। ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্‌দৌলার পতনের পর থেকেই দেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজ শুরু হয় এবং ১৮৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় ব্রিটিশরাজের হাতে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বারা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করার পথ ছিল অত্যন্ত কঠিন ও দুর্গম। তা সত্ত্বেও নিরন্তর লড়াই ও স্বদেশের স্বপ্নই পরিশেষে বাস্তবায়িত করল আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষের। ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালের 'যুগান্তর' পত্রিকার শিরোনাম ছিল— 'ভারতের শৃঙ্খল মুক্তি'।

প্রত্যেক দেশের বিকাশ অভিযাত্রায় একটা সময় আসে যখন দেশ নিজের জন্যে নতুন পরিভাষা তৈরি করে, নিজেকে নতুন শপথের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তির উপলক্ষ্যে এখন সেই সংকল্পের সঠিক সময়। স্বাধীনতার ১০০ বছর উদ্‌যাপন করার এবং নতুন ভারত গড়ার জন্যে বর্তমান সময় হল সেই 'অমৃতকাল'। গত ৭৫ বছরে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অনেক সাফল্য যেমন এসেছে, তেমনি স্বাভাবিক ভাবেই বেশ কিছু প্রতিকূলতার মুখোমুখিও হতে হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক বৃদ্ধি, অন্তর্ভুক্তি এবং উন্নয়ন অর্জনের জন্য সমস্ত সংকট এবং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সেই এগিয়ে চলার পথকে মসৃণ করার কঠিন কাজকেই সম্পন্ন করতে হয়েছে।

আজ স্বাধীনতার ৭৫ বছরের এই যাত্রাপথের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত স্বয়ম্ভরতা এবং সর্বোপরি সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর কার্যকরী ভূমিকার এক সদর্থক রূপ। ঔপনিবেশিক শাসনের দীর্ঘ সময় ভারতের নিজস্ব বহু সম্পদ বিদেশি শাসকেরা হস্তগত করে বিদেশে স্থানান্তরিত করেছিল। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের কাছে সদ্য স্বাধীন দেশের উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং দক্ষতা দুইয়েরই অপরিসীম ঘাটতি ছিল। সেই সময়ে দেশের জিডিপি ছিল মাত্র ২.৭ লক্ষ কোটি, এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৫০ মিলিয়ন টন। সেই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে প্রধান কর্মকাণ্ডগুলি ছিল দেশের জনগণকে শিক্ষিত করা, বিপুল সেই জনসংখ্যার জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যসংস্থান, গণতন্ত্র বাস্তবায়ন এবং শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারকে নিশ্চিত করা। দেশের নিরাপত্তারক্ষাও ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই পটভূমির বিপরীতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের দায়বদ্ধতা ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত Council of Scientific and Industrial Research এর উপর বর্তায় এবং স্বাধীনতার পর থেকে এটি কার্যকরভাবে এর দায়ভার গ্রহণ করেছিল।

১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে ভারত প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। সে সময় এটি ছিল ঔপনিবেশিক শোষণ ও দেশভাগের ভয়াবহতায় বিপর্যস্ত এক অর্থনীতির দেশ। সেই দেশের জন্য একমাত্র পথ ছিল সামনে এগিয়ে চলা। আর সেই এগিয়ে চলার ফল হিসেবে, যে দেশের জন্য রকেটের যন্ত্রাংশ কোনো একসময় সাইকেল এবং পশুবাহিত গাড়িতে উৎক্ষেপণস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মহাকাশ যাত্রা শুরুর জন্যে, সেই ভারত এখন মহাকাশে মানুষকে পাঠানোর পরিকল্পনাও করতে সক্ষম হয়েছে। তাই যে ভারত একটি কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ছিল, ১৯৬০ সালের সবুজ বিপ্লব সেই দৃশ্যপটকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে। ফলস্বরূপ, বর্তমানে ভারত বৃহত্তম ডাল ও পাট উৎপাদনকারী রাষ্ট্র এবং চাল ও গমের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক। ৭০-এর দশক আরো একটি নতুন রঙের সাথে আরেকটি বিপ্লব দেখেছিল। সেটা হল Operation Flood। এর প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভারত আজ বৃহত্তম দুধ এবং দুগ্ধজাত উৎপাদনকারী রাষ্ট্র। এরই সরাসরি ফলস্বরূপ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থান যথেষ্ট উন্নত হয়েছে এবং দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে।

আজ ভারত সারা বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। ভারতের আজ নির্দিষ্ট এবং সমৃদ্ধ মহাকাশ কর্মসূচি রয়েছে এবং বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম সামরিক ব্যয়কারী শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে। স্বাধীনতার পরবর্তী জাতিরাষ্ট্র গঠনের এই পর্যায়ে ভারতের আরো একটি কৃতিত্ব হল উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি মেনে চলা। ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই সাফল্য সারা বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করেছে। যার মূল কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এমন বিশাল ভৌগোলিক আয়তন সত্ত্বেও জাতিগত এবং ধর্মীয় বিভিন্নতাকে বজায় রেখেও সার্বিক সংহতি বজায় রাখতে সক্ষম হবার বিস্ময়কর ক্ষমতা।

এই ৭৫ বছরের সময়কালে ভারতের বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের কিছু উল্লেখযোগ্য সময় সারণী:

১৯৫১ - প্রথম সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন। জওহরলাল নেহেরু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন।

১৯৫৫ - ভারত সরকার ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াকে জাতীয়করণ করে। ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্কের নাম বদলে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া রাখে। বর্তমানে যা ভারতের বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাঙ্কিং এবং আর্থিক পরিষেবা সংস্থা।

১৯৫৬ - এশিয়ার প্রথম পারমাণবিক চুল্লির নকশা নির্মাণ।

১৯৫৮ - মাদার ইন্ডিয়া প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র যা সেরা বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র অস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল।

১৯৬০ – ভারতের সবুজ বিপ্লব শুরু হয়। এটি গম এবং ডালের উচ্চফলনশীল জাতগুলির বিকাশের সাথে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে দেশকে স্বনির্ভর করে।

১৯৬৩ – ভারতের মহাকাশ কর্মসূচিতে প্রথম রকেট উৎক্ষেপণ।

১৯৬৯ - ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ এবং ভারতের প্রথম বাণিজ্যিক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন।

১৯৭০ – অপারেশন ফ্লাড - বিশ্বের বৃহত্তম দুগ্ধ উন্নয়ন কর্মসূচি।

১৯৭৪ - পোখরান I হল ভারতের প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষা। এর মাধ্যমে ভারত পাঁচটি

পারমাণবিক শক্তিধর দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৮৪ - ভারত তার প্রথম মহাকাশচারী রাকেশ শর্মাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যৌথ মিশনে মহাকাশে পাঠায়।

১৯৯১ - অর্থনীতির বিশ্বায়ন-- ভারতীয় অর্থনীতি খুলে দেয় বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মুক্ত বাণিজ্যের দরজা।

১৯৯৫ - ভারতে বিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেড (VSNL) মাধ্যমে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা।

১৯৯৮ - পোখরান II: রাজস্থানের পোখরানে 1998 সালের মে মাসে "অপারেশন শক্তি" কোডনামে পাঁচটি পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করে। এটি ভারতকে একটি পূর্ণাঙ্গ পারমাণবিক রাষ্ট্রে পরিণত করে।

২০০১ - ভারতের বৃহত্তম হাইওয়ে প্রকল্প গোল্ডেন চতুর্ভুজ-যা দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই এবং কলকাতা এই চারটি প্রধান শহরকে সরাসরি সংযুক্ত করে।

২০০৫ – RTI Act সংসদ দ্বারা পাশ হয়েছিল।

২০০৯ - শিক্ষার অধিকার আইন বিল পাশ - শিক্ষাকে প্রতিটি শিশুর মৌলিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা।

২০১৩ - জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন পাশ।

২০১৭ - জিএসটি (পণ্য ও পরিষেবা কর)।

২০২০ - COVAXIN ভারত বায়োটেক দ্বারা ভারতের দেশীয় COVID-19 ভ্যাকসিন, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR)-ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি (NIV) এর সহযোগিতায় তৈরি করা হয়েছে।

১৯৪৭ সালে সদ্য জন্ম নেওয়া স্বাধীন ভারতের কাছে দেশের পুনর্গঠন সরকারের জন্য মুখ্য বিষয় ছিল। এই প্রচেষ্টার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন ভারতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি মূলত কৃষি ও শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতি নজর দেয় এবং যা ভারতকে পর্যায়ক্রমে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগতভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে। গত সাড়ে সাত দশকে ভারত কৃষি, ভারী শিল্প, সেচ, শক্তি উৎপাদন, পারমাণবিক শক্তি সক্ষমতা, মহাকাশ প্রযুক্তি, জৈবপ্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে তাই আজকের ভারত এক আত্মনির্ভর রাষ্ট্রেরই প্রতিচ্ছবি।

ভারতের এই অগ্রগতির যাত্রাকে চিহ্নিত করতে স্বাধীনতার এই ৭৫তম বছরে ভারত সরকার ‘আজাদি কা অমৃত মহোৎসব’ নামে একটি মহৎ উদ্যোগের পরিকল্পনা করেছে। এই উদ্যোগটি ভারতের সেই সমস্ত জনগণের জন্য উৎসর্গীকৃত যারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সদর্থক এবং সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে এবং আত্মনির্ভর ভারতের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের উদ্দেশ্য এবং মহোৎসব উদযাপনের লক্ষ্য হল ২০৪৭ সালে ভারতের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা। মহোৎসবটি তার পাঁচটি স্তম্ভের ভিত্তিতে উদ্‌যাপিত হচ্ছে-- স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, ৭৫ বছরের ধারণা, ৭৫ বছরের অর্জন, ৭৫ বছরের কর্ম এবং ৭৫ বছরের সংকল্প। তাই ভারত সরকারের এই ৭৫ বছর উদ্‌যাপন এবং স্মরণ করার জন্য এই ভাবনা মূলত দেশের জনগণের গৌরবময় ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং কৃতিত্ব কে তুলে ধরার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তৈরি। ‘আজাদি কা অমৃত মহোৎসব’ এর

আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু ২০২১ সালের ১২ মার্চ, ৭৫ সপ্তাহ পরে ১৫ ই আগস্ট ২০২৩-এ যার সমাপ্তি।

স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্ণ করার লক্ষ্যে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে আরো অনেকগুলি কঠিন কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের প্রেক্ষাপটে, অতীতের বিভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছোনোর অভিজ্ঞতা গুলির মূল্যায়নের সাথে ২০৪৭ সালে ভারতীয় স্বাধীনতার শতবর্ষের জন্য সঠিক কর্মপ্রক্রিয়া চিহ্নিত করার এটি একটি উপযুক্ত মুহূর্ত। তাই শতবর্ষ উদ্‌যাপন করতে সক্ষম হওয়ার জন্য ভারতকে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই এবং স্থিতিশীল একটি রাষ্ট্রের পর্যায়ে উন্নীত হতে হবে আর সেই প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে মুখ্য বিষয়গুলি হল :--

১) শিল্প ভিত্তিক কাঠামোগত রূপান্তরের মাধ্যমে টেকসই এবং বিস্তৃত অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

২) গুণমানসম্পন্ন শিক্ষার প্রসার এবং স্বাস্থ্যের সুরক্ষাকে সার্বজনীন করার সক্ষমতা।

৩) বৈষম্য দূরীকরণ, সামাজিক সুরক্ষা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি।

৪) টেকসই কৃষির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতার সার্বিক উন্নতি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং ক্ষুধার দূরীকরণ।

৫) নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে স্থিতিশীল লিঙ্গ-সমতা।

৬) জলবায়ু সহনশীল উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশগত স্থায়িত্বরক্ষা।

এই প্রসঙ্গে উলেক্ষযোগ্য যে ভারত আজ বিশ্বের সাথে সংযুক্ত, তাই বৈশ্বিক সমস্যাগুলিও তার উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সেই একই কারণে স্থায়িত্ব এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিষয়গুলি বৈশ্বিক এবং স্থানীয় উভয় পর্যায়ে আগের তুলনায় ভারতের কাছে এখন আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তাই আমাদের দেশের লক্ষ্য রইল ২০২১ সালে গ্লাসগোতে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনে পক্ষগুলির সম্মেলনের (COP26) এ করা প্রতিশ্রুতি পূরণ।

পরিশেষে এটাই আজ মুখ্য বিবেচ্য যে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সাম্য, ন্যায় এবং ভ্রাতৃত্ববোধ স্বাধীন দেশের বুনিয়াদ, সেগুলি রক্ষা করার দায় এবং দায়িত্ব সকলেরই। যা আমাদের শ্রদ্ধেয় বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে স্বাধীন দেশের অধিকার আমাদের দিয়েছেন, তাঁদের সেই ঋণ স্বীকারের সঙ্গে সমার্থক। তাই আজ পরবর্তী পর্যায়ে যখন ভারত স্বাধীনতার শতবর্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে তখন সংবিধানের অন্তর্নিহিত যে দর্শন এবং দিশার কথা বলা হয়েছে তা যেন দৈনন্দিন জীবনে সঠিকভাবে কার্যকরী হয়। তবেই এই স্বাধীন ভারতবর্ষ সঠিকভাবে এবং সর্বতোভাবে শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেশের কথা' প্রবন্ধের দুটি লাইন আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখেছিলেন, ***"আমাদিগকে নেশন বাঁধিতে হইবে। আমাদের জাতির মধ্যে যে নিত্য পদার্থটি, যে প্রাণ পদার্থটি আছে, তাহাকেই সর্বত ভাবে রক্ষা করিবার জন্য অমদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে গইবে – আমাদের চিত্তকে, আমাদের প্রতিভাকে মুক্ত করিতে হইবে। আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বলশালী করিতে হইবে। এই কার্যে স্বদেশের দিকে আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়, স্বদেশের দিকে আমাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা চাই।"***

স্বাধীনতার ৭৫ ও আজকের ভারত

সায়ন্তনী গুছাইত
প্রাক্তন ছাত্রী

ভারত বহু জাতি ও বহু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মিলনতীর্থ। যুগে যুগে বহিরাগত মানুষের ঢল নেমেছে ভারতের মাটিতে। এসেছে আর্য, শক, হুন, মোগল, পাঠান, এসেছে ফরাসি ডাচ ও ইংরেজ। সব ধারা মিশেছে 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্‌দৌলা পরাজিত হন। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জয়লাভ করে এবং বাংলায় ব্রিটিশ কোম্পানির অনুপ্রবেশের সূচনা ঘটে। ভারতের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হল পলাশির প্রান্তরে। প্রায় দুশো বছর ভারত পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থাকে। বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশপ্রেমিকের আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদানের বিনিময়ে দীর্ঘ দুশো বছরের পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমরা আমাদের বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করি। স্বাধীনতার সূর্য আবার উদিত হল ভারতাকাশে, উড্ডীয়মান হল আমাদের গর্বের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা। জাতির জীবনে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হল।

"স্বাধীনতার পরে কেটে গেছে কত কাল
এসেছে নতুন যুগ, বদলেছে হালচাল।"

অতীতের কথা : আমরা ৭৫ টি স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করেছি। ভালো-মন্দে কেটেছে এতদিন। আমরা কখনও হয়েছি বিভ্রান্ত, আবার কখনও সাফল্যে উদ্বেল। স্বাধীনতা লাভের পর ১৫ থেকে২০ বছর আমরা মহা সমারোহে স্বাধীনতা

দিবস পালন করেছি। ধীরে ধীরে সেই উৎসাহ উদ্দীপনায় ভাটা পড়েছে। আমরা শহীদদের ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদানের কথা প্রায় ভুলতে বসেছি। কিন্তু এই পবিত্র স্বাধীনতাকে রক্ষার দায়িত্ব ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের। যাঁদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ফলে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি, তাঁদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশের জাতীয় সংহতি বারবার বিপন্ন হয়েছে। দেশের পবিত্র মাটি সাম্প্রদায়িক ও জাতি–দাঙ্গায় হয়েছে রক্তাক্ত। দেশের অর্ধেক মানুষ আজও দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। দেশের শতকরা চল্লিশ শতাংশ মানুষ এখনও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। আজও দেশে বহু শিশু শ্রমিক বিভিন্ন কলকারখানায় কর্মরত। এখনও দেশে অপুষ্টিতে ভোগে গর্ভবতী জননী ও কোলের শিশুরা। এখনও বহু সদ্যজ্যাত শিশু কন্যাকে পথের ধারে ধারে পড়ে থাকতে দেখা যায়। নারীরা এখনও সমাজে অবহেলা ও অবজ্ঞার বস্তু হিসাবে পরিগণি হচ্ছে। সামাজিক কুসংস্কারের বিভিন্ন ভ্রান্তি কিছুটা দূরীভূত হলেও, নারী শিক্ষার অবাধ সুযোগ সুবিধার অনুকূল পরিবেশ পরিস্থিতি গড়ে ওঠেনি। দারিদ্র্য সমস্যা ক্রমবর্ধমান।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা : জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মূল্যবৃদ্ধি হল ভারতের বড়ো সমস্যা। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিতে শুধুমাত্র লোকদেখানো আড়ম্বর নয়, আমাদের এই পবিত্র শুভক্ষণে শপথ নেওয়া উচিত যে কোনো মূল্যে আমরা ভারতের জাতীয় সংহতি রক্ষা করব। সেই সঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। দেশে কৃষি ও শিল্পের সুষম বিকাশসাধন হওয়া দরকার। এছাড়া লোকশিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে দেশের মানুষের অজ্ঞতা দূর করতে হবে। সর্বোপরি নিরপেক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে জাতিকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে সবাইকে। এই প্রসঙ্গে একটি কবিতার দুটি লাইন মনে পড়ছে-- "তেত্রিশ কোটি মোরা হতে পারি দীন / তবু মোরা কভু নয় হীন"। স্বাধীনতার আগে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৩ কোটি। এখন ভারতের লোকসংখ্যা ১৩৩ কোটিতে পৌঁছেছে। বর্তমানে দেশবাসীকে এই ভয়াবহ জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে এর সমাধানের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে।

বেকার সমস্যা : সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে বেকার সমস্যা ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি কর্মস্থানগুলিতে লক্ষ লক্ষ বেকারের নাম নথিভুক্ত করা আছে। এর বাইরেও আছে আরও লক্ষ লক্ষ বেকার। ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেশি। লক্ষ লক্ষ বেকার বছরের পর বছর কোনো চাকরি না পেয়ে চরম হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তাদের সামনে আশা নেই। নেই কোনো ভবিষ্যৎ। হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় বাঁচার পথ না পেয়ে কত যুবক যে বিপথগামী হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। সরকারের পক্ষ থেকে কোনো বাস্তব পথ নির্দেশ করে এবং নির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন করে এই বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারলে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান সার্থক হবে।

সংকট ও বিপদ ও প্রতিকার : স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে আমাদের প্রধান হাতিয়ার ছিল একতা ও জাতীয়তাবোধ। স্বাধীনতা লাভের পর আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও ভাষাগত বিভেদ প্রবণতা দেশে অনৈক্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। অসম সম্পদ বণ্টন ও প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার অভাব এই সমস্ত ভেদ বুদ্ধির জন্য অনেকাংশে দায়ি। এই সুযোগে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তৎপর হয়েছে। আজ ভারতের দিকে দিকে বিচ্ছেদ, বিচ্ছিন্নতার লেলিহান অগ্নিশিখা তার বাহুবিস্তার করেছে এবং ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতের জাতীয় সংহতি আজ বিপন্ন। আমরা ভারত মায়ের সন্তান। যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ হই না কেন আমরা ভ্রাতৃসম্পর্কে আবদ্ধ। আমাদের প্রত্যেকের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে- উৎসবে- পার্বণে অবাধ অংশগ্রহণের দ্বার খোলা থাকবে। মিলনের পথ হবে প্রশস্ত। তখন পরমত গ্রহণের উদারতা, পরধর্মকে মর্যাদা দেওয়ার মানসিকতা, বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র ও সহযোগিতা আমাদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির অবসান ঘটাবে। আমাদের শুভবুদ্ধির উদয় ঘটবে।

সমাজে নারীর অবস্থান : বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির যুগেও নানাভাবে চলছে নারীর অবমাননা। সমীক্ষায় জানা গিয়েছে ২০১৬-১৭ সালে যৌন হয়রানির ঘটনা সবচেয়ে বেশি হয়েছে আই.টি ও ব্যাঙ্কিং

সেক্টরে। এর হাত থেকে মেয়েদের মুক্তি কীকরে সম্ভব? এদেশে নারী সম্পর্কে সুস্থ মানসিকতাকে, নবজাগরণের নারী স্বাধীনতা, নারীমুক্তির বাণীকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অতীতের বড়ো মানুষেরা করলেও বর্তমানে তা পরিকল্পিতভাবে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে। পশুপ্রবৃত্তি যেভাবে বাড়ছে তা দেশবাসীকে আতঙ্কিত করছে। আরো আতঙ্কের বিষয় হল রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, নজরুলের আদর্শে গড়া স্বপ্নের ভারতবর্ষে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। প্রশাসন ও সরকারকে এই খুনি, ধর্ষক, ব্যভিচারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজে নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি সমাজকে কলুষমুক্ত করে আদর্শ ভারতবর্ষ গড়ার লক্ষ্যে সর্বস্তরের মানুষকে সচেষ্ট হতে হবে। তবেই ভারতবর্ষের ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন সার্থক হবে।

উন্নতির নানা পরিকল্পনা ও সাফল্য : স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে সফলতার ইতিহাস নেহাত কম নয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ২৬ শে জানুয়ারী আমরা প্রতিষ্ঠিত হই স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। পূর্বে ৪০ কোটি জনগণের খাদ্য সংকুলানের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করতে হত। কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়নের ফলে ভারত খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভর হয়েছে। শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রেও ভারত প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। সারা ভারতবর্ষে এখন বড়ো বড়ো কলকারখানা গড়ে উঠেছে। ভূমি সংস্কার ও গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতির সাহায্যে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়েছে। গ্রামীন বৈদ্যুতিকরণ, সড়ক নির্মাণ, গ্রামীণ রাস্তার উন্নতিসাধন, সাধারণ শিক্ষার প্রসার, নারীশিক্ষার উন্নতি, চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছে। মহাকাশ গবেষণা এবং শক্তির কাজে আণবিক শক্তির ব্যবহারে ভারত আজ পৃথিবীর অন্যতম অগ্রণী রাষ্ট্র। বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রেও ভারতের স্থান উজ্জ্বলতর। ভারত আজ বিশ্ব 'আণবিক ক্লাব'-এর সদস্য। খেলাধূলার ক্ষেত্রেও বিশেষ করে ক্রিকেটে ভারতের বিশ্বজয় এক নজির সৃষ্টি করেছে। সবুজ বিপ্লব ভারতের খাদ্য উৎপাদনকে সমৃদ্ধ করেছে। শিল্পোৎপাদনে ও বিশ্ববাণিজ্যে ভারত প্রভূত উন্নতি করেছে।

পরিশেষে বলতে পারি--"দেশের প্রতি ভালোবাসায় দেশাত্মবোধ হয়,/দেশের স্বার্থ দেখলে তবে সবায় ভালো হয়।"

আমরা সকলে অঙ্গীকার করছি সবার ঊর্ধ্বে দেশের স্বার্থকে স্থান দেব এবং সর্বতোভাবে দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা বজায় রাখব। কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে নেতাজীর মূর্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত এবং প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে একটি আনন্দের বিষয়।

Insightful Gems

অন্তরে অন্দরে

নারীবাদের সহজপাঠ

সৌতি বসু

সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ

'নারীবাদ' শব্দটি আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। তবে, শব্দটির বহুল ব্যবহার সত্ত্বেও সব ক্ষেত্রেই সেটি যে সঠিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, এমন নয়। তাই, নারীবাদ বিষয়ে যে কোনো আলোচনার আগে 'নারীবাদ' বলতে কী বোঝায়, তা একটু বুঝে নেওয়া দরকার। নারীবাদের এক কথায় কোনো সংজ্ঞা হয় না। সহজ কথায়, নারীবাদ বলতে এমন এক ধারণাকে বোঝায় যা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলে। এখন, প্রশ্ন হতে পারে যে, নারীবাদ যদি লিঙ্গ সাম্যের কথাই বলে তাহলে তো উভয়লিঙ্গই সেখানে সমান প্রাধান্য পাবে, তাহলে এই তত্ত্ব বা ধারণার নাম 'নারীবাদ' কেন? একটি বিশেষ লিঙ্গ সেখানে প্রাধান্য পেল কেন? এই প্রশ্নটির উত্তর পেতে হলে, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং তার ইতিহাসকে একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

নারীবাদ একটি স্বতন্ত্র তত্ত্বচিন্তা হিসেবে পৃথিবীর সব দেশে আলোচিত হলেও, প্রাথমিকভাবে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতেই এই নারীবাদী চিন্তার উন্মেষ ঘটে। প্রায় আদিকাল থেকেই নারী মূলত সাংসারিক কাজের পরিমণ্ডলে আবদ্ধ থেকেছে, আর পুরুষ বাইরের জগতের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হয়েছে। জৈবিক নিরিখে পুরুষ ও নারীর ভেদ অনস্বীকার্য। শারীরিক সক্ষমতার দিক থেকেও পুরুষ অনেক বেশিবলশালী আর নারী দুর্বল। তাই কায়িক শ্রমের ক্ষেত্রে পুরুষ সব সময় নারীর থেকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তাছাড়া, নারীকে সন্তান ধারণ এবং সন্তান প্রতিপালনের প্রাথমিক দায়িত্বও নিতে হয়, সে কারণেও বাড়িতে অনেক বেশি সময় দেওয়ার প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে, পুরুষ এইসব দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকার কারণে বাইরের জগতে অনেক বেশি সময় ব্যয় করতে পারে। এখন, এই জৈবিক বিভাজনের জন্য শ্রমবিভাজনের পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক। এর জন্য কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়, কিন্তু সমস্যার সূত্রপাত হয় এখানেই। নারী ঘর বন্দী হয়ে যাওয়ার ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে সে দুর্বল হয়ে যায়, কারণ,তার রোজগারের সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। জীবনধারণের জন্য সে অর্থনৈতিক দিক থেকে পরের উপর অর্থাৎ পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক এই পরনির্ভরশীলতা তার সামাজিক অবস্থানকে দুর্বল করে দেয়। অর্থনীতির ক্ষমতা মূল্যায়নের সূচক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে যা স্বাভাবিক শ্রমবিভাজন হিসেবে চিহ্নিত হওয়া উচিত ছিল, তা, বৈষম্যের রূপ ধারণ করে ও নারী সামাজিক স্তরে ক্ষমতাচ্যুত হয়। নারীবাদীরা মনে করেন, সমাজে সবসময় ক্ষমতার অদৃশ্য লড়াই চলতে থাকে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তি সবসময়ই ক্ষমতাহীনকে শোষণ করে আরো বেশি ক্ষমতাবান হতে চায়। ক্ষমতার ধরনই এমন যে তা কখনো

সমস্তরে বণ্টিত হয় না। ক্ষমতা সবসময়ই উচ্চ-নীচ স্তরভেদের সোপান গড়ে তোলে; উচ্চতর সোপানে অবস্থানকারী তার থেকে নিম্নতর স্তরে অবস্থানকারীকে শোষণ করে, নির্যাতন করে। ফলে, নারী যখন ক্ষমতার নিরিখে পুরুষের তুলনায় নিম্নতর স্তরে অবস্থান করে তখন নারীও একই নিয়মে শোষণ এবং বঞ্চনার শিকার হয়। নারীবাদীরা তাই দাবি করেন যে, যেকোনো সমাজেই পুরুষেরা যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, নারীদেরও সেইসব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে। এই পৃথিবীতে সব লিঙ্গের মানুষের সমান অধিকার, সমান মর্যাদা এবং সমান সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে বলে নারীবাদ মনে করে এবং লড়াই করার জন্য সমান জমির দাবি জানায়।

আমাদের সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য যে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন মাত্রায় ছড়িয়ে আছে তা একটু স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে তাকালেই উপলব্ধি করা যায়। লিঙ্গ বৈষম্য নিয়ে আলোচনার আগে 'লিঙ্গ' কথাটির অর্থ বুঝে নেওয়া দরকার। সাধারণভাবে 'লিঙ্গ' বলতে মানুষের যৌন পরিচয়কে বোঝানো হয়। কিন্তু, নারীবাদী চিন্তায় 'লিঙ্গ' কথাটির দ্বারা ব্যক্তির যৌন পরিচয়কে বোঝানো হয় না। নারীবাদীরা ব্যক্তির লিঙ্গ পরিচয়কে তার যৌন পরিচয় থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করেন। মানুষের যৌন পরিচয় (sex identity) তার দৈহিক গঠন, ক্রোমোজোমের গঠন বা হরমোনের ক্রিয়ার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। প্রাথমিকভাবে এই যৌন পরিচয়ের ভিত্তিতে একজন মানুষের পরিচয় তৈরি হলেও পরবর্তীকালে তার আরো পরিচয় গড়ে ওঠে, যা যৌন পরিচয়ের মতো প্রকৃতিদত্ত নয়, সেটি হল তার লিঙ্গ পরিচয়। নারীবাদীদের মতে, এই লিঙ্গ পরিচয় এক সামাজিক নির্মাণ। প্রত্যেকটি মানুষ যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন সে কোনো একটি যৌন পরিচয় নিয়েই জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু তারপর সমাজের প্রভাবে তার একটি ভিন্ন সত্তা গড়ে ওঠে। নারী এবং পুরুষের কাছ থেকে সমাজের কিছু প্রত্যাশা থাকে। সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তি হিসেবে সেই প্রত্যাশা পূরণের একটা দায় সাধারণভাবে ব্যক্তির থাকে। ফলে, সমাজের প্রত্যাশা অনুযায়ী ব্যক্তি নিজেকে গড়ে তোলে। নারী এবং পুরুষের ক্ষেত্রে সমাজের প্রত্যাশা ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই কিছু আচরণ, কিছু গুণাবলী প্রশংসনীয় আর এগুলির ব্যতিক্রম অবশ্যই তিরস্কারযোগ্য। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। সমাজ মনে করে যে, নারী হবে ধৈর্যশীলা, পুরুষ হবে হঠকারী; নারী স্তিমিত, পুরুষ আগ্রাসী; মানসিকভাবে নারী দুর্বল, পুরুষ সবল; নারী ভীতু, পুরুষ সাহসী; নারী আবেগপ্রবণ, পুরুষ যুক্তিবাদী প্রভৃতি। সমাজ যে শুধু নারী-পুরুষে এই পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ আরোপ করে তাই নয়, এর ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত তিরস্কারযোগ্য ও অনুগামী দৃষ্টান্তকে পুরস্কারযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করে। এইসব সামাজিক গুণাবলী আরোপণের মাধ্যমে ব্যক্তির যে নতুন সত্তা গড়ে ওঠে, সেটাই নারীবাদী চিন্তায় তার লিঙ্গ পরিচয় হিসেবে বিবেচিত হয়। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি এমনভাবেই আমাদের সঙ্গে জুড়ে যায় যে মনে হয় সেগুলি তার প্রকৃতি দত্ত স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যেমন সাধারণভাবে মনে করা হয় যে নারী আবেগপ্রবণ এবং পুরুষ যুক্তিশীল বা নারী মানসিকভাবে কোমলস্বভাবা, কিন্তু পুরুষ রুক্ষ, কঠিন

মনোভাবসম্পন্ন; নারী ভীতু, পুরুষ সাহসী; কিন্তু এগুলো সবই সামাজিক নির্মাণ। এই বৈশিষ্ট্যগুলি কোনভাবেই এমন কোনো হরমোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না যে সব পুরুষের ক্ষেত্রেই একরকম হবে বা সব নারীদের ক্ষেত্রে অন্যরকম হবে। আর যদি তা হত, তাহলে এই গুণগুলির ব্যতিক্রম কখনোই দেখা যেত না, যা আমরা প্রায়শই দেখতে পাই। যাই হোক, যে কোনো ভেদ তা যৌনভেদই হোক বা লিঙ্গভেদ-- তা যদি নিছক ভেদ হিসেবেই উপস্থিত থাকতো তাহলে কোন সমস্যা হত না কিন্তু এই ভেদের সঙ্গে উচ্চ-নীচ স্তরভেদের ধারণা জুড়ে যাওয়ার কারণে সমস্যার সূত্রপাত হয়। একজন ভালো অন্যজন খারাপ-- এইরকম মূল্যায়নসূচক চিন্তার সূচনা হয়। দুজনেই নিজের নিজের মতো গুণ সম্পন্ন, এইরকম চিন্তাভাবনা আর সম্ভব হয় না। এই চিন্তাভঙ্গিই লিঙ্গ বৈষম্যের পথ প্রশস্ত করে।

নারীবাদীরা মনে করেন, সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত হয়। নারীবাদীরা লিঙ্গ বৈষম্যের তিনটি স্তরের কথা বলেন- ১. Sexism, ২. Patriarchy ও ৩. Androcentrism। Sexism-এ নারীকে সরাসরি তার জৈবিক গঠনের নিরিখে যৌন আক্রমণ করা হয়। বিভিন্ন যৌন হেনস্থার মধ্য দিয়ে যা সহজেই প্রকাশিত হয়। পিতৃতন্ত্র বা patriarchy হল লিঙ্গ বৈষম্যের প্রতিষ্ঠানিক রূপ। প্রতিষ্ঠানগত দিক থেকে এক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সামাজিক নিয়মের মধ্য দিয়ে লিঙ্গ বৈষম্যকে সমাজের গভীরে প্রবেশ করানো ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে কায়েম রাখার প্রয়াসই হল এই স্তরের মূল লক্ষ্য। Sexism বা বা যৌনতা ভিত্তিক বৈষম্যের তুলনায় পিতৃতান্ত্রিক স্তরের প্রভাব অনেক বেশি। তৃতীয় স্তরে আছে androcentrism। Androcentrism হল তাত্ত্বিক স্তরে লিঙ্গবৈষম্য। নারীবাদীরা মনে করেন, লিঙ্গ বৈষম্য যে শুধু বাহ্যিক স্তরে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবেই প্রকাশ পায়, তাই নয়, তার প্রভাব তত্ত্বস্তরেও সঞ্চারিত হয়ে যায়। তত্ত্বের জগৎ যাকে আমরা লিঙ্গ অনপেক্ষ বলেই জেনে এসেছি, নারীবাদীদের মতে তাও বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তি পায়নি। তত্ত্ব যেহেতু প্রয়োগের জনক, তাই তত্ত্বের মধ্যেই যদি লিঙ্গ বৈষম্যের বীজ লুকিয়ে থাকে তাহলে তা যে প্রয়োগকেও কলুষিত করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নারীবাদী তাত্ত্বিকরা বিভিন্ন তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে লিঙ্গবৈষম্যমূলক চিন্তা কীভাবে লুকিয়ে আছে তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেই গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। বরং, লিঙ্গ বৈষম্যের অন্য দুটি স্তরের দিকে মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে। Sexism-এর প্রকাশ যেসব যৌন হেনস্থার ঘটনার মধ্য দিয়ে ঘটে, সেগুলি বিভিন্ন আইনকানুন দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয়। তবে, কোনো সমস্যাকেই শুধুমাত্র আইন-কানুন দিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। চিন্তার জগতে পরিবর্তন না এলে, শুধুমাত্র বাহ্যিক বল প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো সমস্যাকে নির্মূল করা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। অন্যদিকে পিতৃতন্ত্র হল এমন এক ব্যবস্থা যা লিঙ্গ বৈষম্যকে খুব সুচারুভাবে বহন করে নিয়ে চলে। Sexism -এ লিঙ্গ বৈষম্যকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর একটা প্রবণতা থাকে, যা পিতৃতন্ত্রে থাকে

না। বরং, পিতৃতন্ত্র এমন এক ব্যবস্থা গড়ে তোলে যাতে লিঙ্গ বৈষম্যই স্বাভাবিক রূপে প্রতীত হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি সহজে বোঝা যেতে পারে। আলোচনার শুরুতেই আমরা দেখেছি যে, নারীর অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা তার ক্ষমতাচ্যুত হবার অন্যতম কারণ। পিতৃতন্ত্র নারীর এই অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতাকে ন্যায্য রূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেখানোর চেষ্টা করা হয় যে, নারী যেহেতু শারীরিকভাবে দুর্বল এবং সে মাতৃস্বরূপা, তাই তার সাংসারিক কাজকর্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকা উচিত। বাইরের রুক্ষ পৃথিবীর যাবতীয় মন্দপ্রভাব থেকে নারীকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তাকে ঘরবন্দী করা হয়েছে। নারীর মঙ্গলের জন্যই এই প্রয়াস। নারী স্বভাবতই কোমল প্রকৃতির, আবেগপ্রবণ, স্নেহশীলা, যুক্তিহীন তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো কঠিন দায়িত্ব থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়েছে, সেই কঠিন দায়িত্ব বর্তেছে পুরুষের মজবুত কাঁধে। পুরুষের দায়িত্ব সিদ্ধান্ত নেওয়া আর নারীর দায়িত্ব তা বহন করে চলা। একই সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে যে, পিতৃতন্ত্র একজন নারীর লিঙ্গগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করার মধ্যে দিয়ে কিন্তু তার অর্থনৈতিক বা সামাজিক গুরুত্বকে কম করে দেখানোর চেষ্টা করে। ভালোভাবে অংক করার ক্ষমতাকে যত প্রশংসনীয় বলে বিবেচনা করা হয়, সাংসারিক কাজ সুন্দর করে করতে পারার ক্ষমতাকে কিন্তু আদৌ ততখানি মর্যাদা দেওয়া হয় না। ফলে, পিতৃতন্ত্র লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্য আরোপণের মধ্যে দিয়েই যে একটা সূক্ষ্ম রাজনীতিকে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু কাজটি এতই সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সেই ব্যবস্থাকে আত্তীকরণ করে এবং লিঙ্গ বৈষম্যটি স্বাভাবিক বলেই প্রতীত হয়। এর পিছনে লুকিয়ে থাকা সূক্ষ্ম রাজনীতি চোখের আড়ালেই থেকে যায়।

নারীবাদীরা বলেন, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই রাজনীতি বিষয়ে সচেতন হতে হবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে লুকিয়ে থাকা রাজনীতিকে চিহ্নিত করতে হবে এবং তাকে নির্মূল করার চেষ্টা করতে হবে। দুটি বস্তু বা দুজন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য থাকতেই পারে, সেটাই স্বাভাবিক, সেই পার্থক্যকে স্বীকার করাও স্বাভাবিক, কিন্তু তাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ স্তরভেদ সৃষ্টি করে একজনকে ভালো আর অন্যজনকে মন্দ শিরোপাতে ভূষিত করা অনুচিত। নারীকে নিজের কর্তৃত্ব নিজেকেই নিতে হবে। নিজের সমস্যাকে নিজের মতো করে বুঝতে হবে, নিজের ভাষায় তা প্রকাশ করতে হবে। লিঙ্গ বৈষম্যের কোন সমরূপী চেহারা নেই, তা ভিন্ন ভিন্ন দেশ কালে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। তাই এই সমস্যার সমাধান খুব সহজ নয়। রাতারাতি এই সমস্যার সমাধান সম্ভব এমন ভাবাও উচিত নয়। এই সমস্যা তো বাহ্যিক নয়, মানুষের মনের গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে। দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন এবং সঠিক শিক্ষার আলোতেই ভবিষ্যতে এই সমস্যার সমাধান হয়তো সম্ভব হতে পারে।

অবহেলিত ও অত্যাচারিত নারীসমাজ

অন্বেষা মান্না

তৃতীয় সেমেস্টার, পদার্থবিদ্যা বিভাগ

ভূমিকা

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক শতাংশই দখল করে রয়েছে নারীজাতি। নারীদের নিয়ে যে সমাজ গড়ে ওঠে তাই হল নারীসমাজ। সমাজগঠনে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও নারীদেরকে যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পদদলিত করে রাখা হয় তার নজির আমরা ইতিহাসের পাতা ওল্টালেই দেখতে পাব। স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আমরা লক্ষ্য করেছি। তবুও নারীদের এটা বোঝানো হয় যে, তাদের কাজ একমাত্র বাড়ির অন্দরমহলে। আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কিছু প্রতিনিধি নিজেদের পৌরুষত্ব দেখানোর জন্য এমনটা করে এসেছে। তবুও নারীরা আজ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে নিজেদের পায়ের শিকল ছিন্ন করে সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। তবে যে এর নেপথ্যে কতই না নারীবিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তা বলার অবকাশ থাকে না। যদিও এর পেছনে কিছু সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনাসম্পন্ন মহান ব্যক্তিবর্গের অবদান রয়েছে তা অনস্বীকার্য। বর্তমানকালেও সমাজে নারী অবহেলা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি।

নারীরা যেভাবে অত্যাচারিত ও অবহেলিত হয় তা নিম্নে তুলে ধরা হল--

সমাজ দ্বারা

নারীদের শোষণ করার জন্য সমাজে বেশ কিছু নিয়ম চালু করা হয়েছিল তার মধ্যে কিছু নিয়মের বদল ঘটলেও কিছু নিয়ম আজও গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাথাচাড়া দিচ্ছে যা ভাবলে আমাদের বিশেষত নারীদের গা শিউরে ওঠে। সমাজের চোখে নারীরা যেন কোনো দ্রব্যসামগ্রী। তাই তো আজও কো্নো নারী তার স্বামীকে হারালে সমাজ যেন তাকে গিলে খেতে চায়। তাকে কোনো মঙ্গলসূচক কাজে হাত দিতে দেওয়া হয় না। এককথায় তাদেরকে কোণঠাসা করে রাখা হয়। কোনো নারী যদি বাইরের কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরতে দেরি করে তাহলে সমাজ তার উদ্দেশ্যে যেসব কুরুচিকর মন্তব্য করে তা সত্যি মেনে নেওয়া যায় না। এইসব প্রতিবন্ধকতা কেটে যাক--একজন নারী হিসেবে এই কামনা করি।

শিক্ষাক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত

শিক্ষা নাকি জাতির মেরুদণ্ড অথচ সেই মেরুদন্ড সোজা করার অধিকার থেকে নারীদের বঞ্চিত করা হয়। একটি পরিবারে পুত্র ও কন্যাসন্তান দুইই থাকলে উচ্চশিক্ষার জন্য পরিবার পুত্রসন্তানের জন্য অর্থ ব্যয় করতে রাজি থাকেন আর কন্যাসন্তানকে দ্রব্যসামগ্রীর মতো অন্যের হাতে তুলে দিতে পারলে ওঁরা নিশ্চিন্ত হন। পুত্রসন্তানকে পড়ানোর পেছনে কারণ হিসেবে তাঁরা বলেন--বৃদ্ধ বয়সে পুত্ররা

তাদের লাঠি হবে অর্থাৎ দায়িত্ব নেবে। অথচ একজন নারী তার সন্তান অর্থাৎ দেশের ভাবি প্রজন্মকে মানুষ করে তোলে। নারীকে যদি সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা না হয় তবে সে ও তার সন্তানকে ঠিকভাবে মানুষ করতে পারবে না ফলে সমাজ পিছিয়ে পড়বে। তাই নারীশিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক।

পরিবার দ্বারা

নারী অবহেলায় পরিবারও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। নারীরা যদি পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়, তার সেই চাওয়ার মর্যাদা না দিয়ে তাকে বিয়ে দেওয়ার চাপ দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে নারীরা অনেকসময় এটা মেনে নিতে বাধ্য হন। তারপর বিয়ে করেও তার মানসিক শান্তি অধিকাংশ সময় থাকে না, যদি তার স্বামী একজন খারাপ মানুষ হন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তার স্বামীর পাশাপাশি সে তার শ্বশুর ও শ্বাশুড়ির দ্বারা শারীরিক ও মানসিক উভয়দিক থেকে তীব্রভাবে অত্যাচারিত হন।

কন্যাভ্রূণ হত্যা

যে সন্তান জন্মই নিল না, যে কিনা পৃথিবীর আলো দেখল না, তাকে কিনা তার বাবা মা, যারা তার সবচেয়ে কাছের মানুষ তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কেন এমন সিদ্ধন্তে তারা উপনীত হলেন? কারণ সে একজন কন্যা হিসেবে জন্ম নেবে। অথচ আমরা সবাই নাকি একজন নারীর গর্ভে বেড়ে ওঠার পর ভূমিষ্ঠ হয়েছি। যে নারী ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে তাকেই আমরা কী করে গর্ভাবস্থায় হত্যা করতে পারি? শুধুমাত্র পুত্রসন্তান লাভের আশায় আমরা একের পর এক কন্যাভ্রূণ হত্যাকাণ্ডে সামিল হই, যদিও লিঙ্গনিধারণ দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় তবুও গোপনে লিঙ্গনিধারণ চলছেই।

বাল্যবিবাহ

বলাবাহুল্য, বাল্যবিবাহ আইন করে রোধ করার চেষ্টা করা হলেও বর্তমান দিনে নারীরা বাল্যবিবাহের শিকার। এমনকি আমি যেখানে বাস করি সেখানে বাল্যবিবাহ প্রচুর ঘটে। তবে এর পেছনে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন নয় এমন অসচেতন পরিবারের লোকজনদের ভূমিকা বেশি থাকে। তবে বর্তমান দিনে অনেক নারী ঝোঁকের বশে একজন অল্পবয়স্ক পুরুষের হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

বাড়ির বাইরে

বাড়ির বাইরে নারীরা কি সত্যি সুরক্ষিত? নারীদের সুরক্ষা আজ প্রশ্নের মুখোমুখি। একজন নারী বাইরে বেরোলে কেন তার বাবা-মা কে দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে? নারীদের তো রাতে বাড়ির বাইরে বেরনো দুষ্কর। কিছু কিছু গণপরিবহণেও প্রতিদিন নারীদের অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু কেন এমনটা হবে তাদের সঙ্গে? তাছাড়া যখন তারা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে তখন তারা কিছু নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা নেতিবাচক ভাবনাসম্পন্ন লোকের খপ্পরে পড়ে, যারা খারাপ মন্তব্যের পাশাপাশি খারাপ আচরণও করতে তৎপর হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতা

স্বাধীন কথাটির অর্থ কম বেশি আমাদের জানা। সত্যি কি মেয়েরা তার নিজের অধীনে থেকে জীবন অতিবাহিত করে থাকে? প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে, জন্মের পর থেকেই তারা কারো না কারোর অধীনে থেকে সারাজীবন কাটিয়ে দেয়। জন্মের পর বাবার পরিচয়ে, তারপর যখন একটু বড়ো হয়ে বিবাহ উপযুক্ত তখন আবার সে স্বামীর পরিচয়ে, শেষজীবনে সে তো তার সন্তানের অধীনস্থ হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেয়।

বিধিনিষেধ

মেয়েদের জন্য কতই না বিধিনিষেধ। যদিও এই নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছে সমাজ। অনেক কাজ শুরু করার আগেই তাদের থামিয়ে দেওয়া হয় এই বুঝিয়ে যে, মেয়েদের এ কাজ করা শোভা পায় না এতে সমাজ কী বলবে। মেয়েরা যদি দ্বিতীয়বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় সেটা সমাজ মেনে নিতে পারে না কিন্তু একজন ছেলে যদি বারংবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় তা সমাজ অনায়াসে মেনে নেয় ।

সচেতনতা

সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে নারীদেরকে তাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের প্রতিহয়ে চলা অন্যায়ের প্রতিকার করতে হবে। সেইজন্য মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। এই সচেতনতা ছাত্রজীবনে গড়ে তুলতে পারলে খুব ভালো হয়, কারণ ছাত্ররাই সমাজের মূল চালিকাশক্তি। সচেতনতা বৃদ্ধিতে আমরা বিভিন্ন Awareness Camp করতে পারি।

উপসংহার

যে দেশে নারীরা যত স্বাধীন সেই দেশ তত উন্নত। কিছু কিছু পরিবার আজ উদারমনস্ক হতে পারলেও সব পরিবার এখনও নারীদের প্রতি উদারমনস্ক হতে পারেনি। চলুন আমরা সকলে মিলে এমন এক পৃথিবী গড়ে তুলি যেখানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার। যেই পরিবেশে নারীরা নির্দ্বিধায় নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারবে। নারীদের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথাই বলতে চাই—'**নারী তুমিও পারো, তুমিও এগিয়ে চলো**'।

Indian Women and Independence

Yasmin Chaudhuri

Assistant Professor, Dept. of English

True independence is a state in which a person or entity is able to think, act, and make decisions without interference or influence from any outside forces. It means having the freedom to determine one's own actions, beliefs, and choices without being coerced or controlled by others. True independence allows individuals to be self-sufficient and self-determined, enabling them to live their lives in a way that is authentic and true to them.

The value of true independence is immeasurable, as it allows individuals to think, act, and make decisions without being constrained by external factors such as societal norms, expectations, or external pressures. This can lead to a sense of personal fulfillment and satisfaction, as individuals are able to live their lives in a way that aligns with their own goals and aspirations. True independence also allows individuals to be self-reliant and self-sufficient. This means that they are able to take care of themselves and their needs without relying on others for support or assistance. This can lead to a sense of empowerment and confidence, as individuals are able to handle challenges and difficulties on their own and to take control of their own lives. Furthermore, true independence allows individuals to be free from external control or manipulation. This means that they are able to resist attempts by others to influence or control their thoughts, actions, or decisions. This can help individuals to maintain their autonomy and to protect their own interests, ensuring that they are not exploited or taken advantage of by others.

India is a sovereign nation and is considered an independent country. It gained independence from British rule on August 15, 1947, and has since been a democratic republic governed by its own constitution. India has its own government, military, and economy, and conducts its own domestic and foreign affairs. India is a diverse country with a population of over 1.3 billion people. As such, it is difficult to make generalizations about the condition of women in India. However, it is fair to say that women in India face a number of

challenges, including gender-based violence, discrimination, and unequal opportunities in education and employment.

Equality between men and women is important for many reasons. It is a fundamental human right, as outlined in the Universal Declaration of Human Rights, which states that "all human beings are born free and equal in dignity and rights." This means that everyone, regardless of their gender, should have the same opportunities, rights, and obligations. Equality between men and women is also important for social, economic, and political reasons. When women are denied equal opportunities, it not only affects them, but it also has a negative impact on their families, communities, and societies as a whole. For example, when women are not able to access education and training, they are not able to fully participate in the workforce and contribute to their countries' economies. This not only limits their own opportunities, but it also means that their societies are missing out on their skills, talents, and potential contributions. Furthermore, when women are not able to fully participate in the political process, their voices and perspectives are not represented in decision-making. This can lead to policies and laws that do not adequately address the needs and concerns of half of the population, which can have negative consequences for everyone. Equality between men and women is also important for achieving gender equality in other areas. For example, when women have equal access to education and training, they are more likely to have access to healthcare, to be able to provide for themselves and their families, and to be able to make decisions about their own lives. This, in turn, can help to reduce gender-based violence, discrimination, and other forms of inequality. Additionally, equality between men and women is important for promoting social justice and creating more inclusive and harmonious societies. When everyone has the same opportunities and rights, it can help to break down barriers, foster understanding and respect, and create a more equitable and fair world for all.

On pen and paper, Indian women have the right to make choices and decisions about their own lives, just like women in any other country. This includes choices related to their education, career, relationships, and personal goals. Indian women also have the right to vote and participate in the political process, and many are active in various fields and industries. However, like women in many other countries, Indian women still

face challenges and barriers that limit their ability to fully exercise their rights and choices. Some of the most common problems they face include gender-based violence, unequal pay and lack of access to education and healthcare.

One of the major problems facing Indian women is gender-based violence, which includes physical, sexual, and emotional abuse. In India, it is estimated that a woman is raped every 15 minutes and nearly 40% of women have experienced some form of domestic violence. These high rates of violence against women can be attributed to a number of factors, including a culture of patriarchy and gender discrimination, as well as a lack of effective laws and enforcement to protect women from abuse.

Another major challenge facing Indian women is the unequal pay and lack of opportunities in the workforce. Despite laws and policies aimed at promoting gender equality, women in India continue to face discrimination in the workplace, with many women being paid less than men for doing the same work. In addition, women often have limited access to education and training, which can limit their ability to enter the workforce and advance in their careers.

Access to education and healthcare are also major challenges for Indian women. In India, girls are often not given the same educational opportunities as boys, and many girls drop out of school at a young age due to poverty, early marriage, and other factors. As a result, women in India have lower levels of education and literacy compared to men, which can limit their ability to access quality healthcare and other essential services.

Indian women face a wide range of challenges and discrimination. Despite progress in recent years, much work remains to be done to ensure that women in India have equal rights and opportunities and can then become truly independent. There are several directions that can prove fruitful in liberating women of India. First and foremost, education is critical for women to gain the knowledge and skills they need to succeed in the workforce and have more control over their lives. Encouraging girls to stay in school and providing them with access to quality education can help them develop the confidence and ability to make their own decisions and pursue their own

goals. In addition to education, women in India also need to have access to economic opportunities. This can include support for starting and growing businesses, access to credit and financing, and equal pay for equal work. Providing women with the tools and resources they need to generate their own income can help them gain financial independence and have more control over their lives. Another important step is to address social and cultural barriers that prevent women from achieving their full potential. This can include challenging discriminatory laws and policies, working to change cultural norms and stereotypes that limit women's opportunities, and supporting women's rights organizations that are working to advance the rights and interests of women.

Overall, there is no single solution for increasing the independence of women in India. Instead, it will require a combination of efforts on multiple fronts, including education, economic empowerment, and social and cultural change. By working together and supporting one another, women in India can continue to make progress towards greater independence and equality.In conclusion, equality between men and women is crucial for upholding fundamental human rights, promoting social, economic, and political development, achieving gender equality in other areas, and fostering social justice and inclusion. It is a fundamental value that should be upheld and promoted by individuals, communities, and governments alike.

নারী

পারমিতা বেরা

দর্শন বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

'নারী' শব্দটি কেবল একটি শব্দ নয়। শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে স্নেহময়ী, তেজস্বীসহ নানা অন্তর্নিহিত মূল্যবান অর্থ। এই জগৎকে পরিচালনা করার জন্য নারীদের প্রয়োজন, নারী ছাড়া জগৎ শক্তিরহিত, অথচ আজ এই সমাজে নারীদের একটি অবহেলিত, লাঞ্ছিত বস্তু বলেই যেন মনে করা হয়। আজ আমরা সকলে যে কারণে স্বাধীনভাবে নিজেদের পথে যেতে পারি, ইচ্ছেমতো এগিয়ে গিয়ে চূড়ান্ত জায়গায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করি ; সেই স্বাধীনতা লাভের জন্য রানি লক্ষ্মীবাঈ, মাতঙ্গিনী হাজরা, সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষী পণ্ডিত প্রমুখ নারীর অবদান রয়েছে।

সেকালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেয়েদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করেন। স্থাপন করেন নারীদের জন্য বিদ্যালয়। এছাড়াও তিনি মেয়েদের জন্য বহুবিবাহ প্রথা রদ করার পক্ষে জনমত গড়ে তোলেন। নিজে উদ্যোগী হয়ে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেন।

এই পুরুষশাসিত সমাজে আজও নারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলেই গণ্য করা হয়, কিন্তু পুরুষের শৈশব থেকে বড়ো হয়ে ওঠা এই নারীর হাত ধরেই। নারীরা একদিকে মা হয়ে সংসার ও সন্তানকে আগলে রাখে; অন্যদিকে, মা দুর্গার মতো অসুরনিধন করে সমাজকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

বলা হয়, একজন সফল পুরুষের সাফল্যের মূলে থাকে একজন নারীর অবদান। যাইহোক, নারীদের প্রসঙ্গে কিছু বিখ্যাত ব্যক্তিদের কথা উদ্ধৃত করছি--

- এ. পি. জে .আব্দুল কালাম

নারী কখনও হারে না, সমাজ কী বলবে এটা বলে ভয় দেখিয়ে তাদের হারানো হয়।

- কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নারী দাসী বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নারী রাণীও বটে।

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

নারী জাতি এখনও দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হিসেবে বিবেচিত, এমনটি হলে সমাজের সার্বিক উন্নতি কখনও সম্ভব নয়।

মহান ব্যক্তিদের বক্তব্য মেনে নিয়েই বলব নারীদের শুধুমাত্র অবহেলিত নিপীড়িত বস্তু না ভেবে তাঁদের সম্মান ও যোগ্য অধিকার দেওয়া উচিত, কেননা নারীরা কারো থেকে কোনো অংশে কম নয়। আজ নারীরা ছেলেদের থেকে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন কাজ করে ও তাঁর নিজের বাবা ও মায়ের দায়িত্ব নেয়। সর্বোপরি সমাজের দায়িত্ব নিয়ে সকলকে আগলে রাখে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়।

দুর্গাপূজার অঙ্গে কুমারী পূজা

সোমা মাইতি
ভূগোল বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

শারদীয়া দুর্গোৎসব বাঙালির প্রধান উৎসব। ভারতের অন্যান্য স্থানে 'নবরাত্রি 'উৎসব হিসেবে পালিত হয়। যে পূজায় স্থাপন, পূজন, বলিদান ও হবন—এই চারটি প্রধান কর্মের অনুষ্ঠান হয় তাকে 'মহাপূজা' বলা হয়। একে কলিকালের অশ্বমেধ যজ্ঞও বলা হয়। এই পূজার বিধিব্যবস্থা, দ্রব্যাদি সংগ্রহ, ক্রিয়াকাণ্ড অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য। শরৎকালে প্রকৃতির সর্বত্র আদ্যাশক্তির প্রকাশ হয়। মানুষ দেবীকে আবাহন করেছে আগমনী সংগীতের মাধ্যমে। জগতের আনন্দযজ্ঞে সকলের নিমন্ত্রণ।

প্রাচীন কালে জমিদার বাড়িতে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হত। এখনও পুরনো বনেদি পরিবারে এই পূজা হয়। জমিদার বাড়ির পূজায় সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করত। কিন্তু তাদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না । পরবর্তীকালে সমাজ সচেতন মানুষ চাঁদা তুলে কোনো স্কুলের মাঠে অথবা ক্লাবের ঘরে এই পূজা শুরু করল। সেই থেকে দুর্গাপূজা সর্বজনীন রূপ পেল। এছাড়া দুর্গাপূজার উপকরণ সংগ্রহের জন্য কামার, কুমোর, ডোম, মালাকার, শবর প্রভৃতি সমাজের সব স্তরের মানুষের সহায়তা প্রয়োজন। সর্বার্থেই এটি সর্বজনীন।

এই মহাপূজা বা দুর্গাপূজার অঙ্গে কুমারী পূজার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। কারণ এই পূজার মাধ্যমে নারীদের সম্মান ও মর্যাদা দান করা হয়। বলা হয়, যে দেশে নারীরা পূজিতা হন সেখানে দেবতারা আনন্দ লাভ করেন। যেখানে নারীরা পূজিতা হন না, সে দেশের সকল ক্রিয়াই নিষ্ফল।

প্রতিমা তৈরি হয় নানা জড়বস্তু দিয়ে, তাই একে পূজার উপযোগী করতে দেবত্ব সম্পাদন করতে যে প্রক্রিয়া করা হয় তাকে 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' বলে। পুরোহিত নিজের অন্তরে দেহ শুদ্ধি, আত্ম শুদ্ধি প্রভৃতি নানা উপায়ে দেবতাকে অনুভব করে নিজের চেতনায় প্রতিমাকে চেতন করে তোলেন। সেই দেবীকে এখন আমরা সাক্ষাৎ দেবী জ্ঞানে পূজা করি।

(২)

কুমারী পূজা : দেবীকে কেবল প্রতিমায় নয়, সাধক দেখতে চান জীবন্ত বিগ্রহে। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—"সব স্ত্রীলোক ভগবতীর একটা রূপ। শুদ্ধাত্মা কুমারীতে ভগবতীর বেশি প্রকাশ।" সাধকগণ এই জীবন্ত প্রতীক পূজা করে জগৎ মাতার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন। সংসারে যে দেহ মধ্যে দেবীস্বরূপ পরিলক্ষিত হয় তাকেই পূজার ক্ষেত্রে 'কুমারী' নির্বাচন করা হয়।

এক থেকে ষোলো বছরের কন্যা পূজায় গৃহীতা হয়। বয়স অনুযায়ী কুমারীর নামকরণ করা হয়। শাস্ত্র নির্দিষ্ট নামে সংকল্প ও পূজা চলে।

কুমারীকে সুসজ্জিতা করে কাঠামোতে বসিয়ে মণ্ডপে বসানো হয়। দেবীকে কন্যা রূপে বরণ আবাহন করা হয় আবার বিদায় জানানো হয়। পশ্চিমবঙ্গে বেলুড় মঠে সর্বপ্রথম কুমারী পূজার প্রচলন হয়। কাশ্মীরের অমরনাথ দর্শনের যাত্রা পথে বারামুল্লায় স্বামী বিবেকানন্দ এক মুসলমান মাঝির চার বছরের কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হন, এবং তাকে 'উমা' রূপে পূজা করেন। আবার ওই বছরেই অক্টোবর মাসে কাশ্মীরের ক্ষীর ভবনের মন্দিরের পাশে একটা কুম্ভের জলেই দেবীর কাল্পনিক পূজা করেন। সেখানে থাকাকালীন প্রতিদিন একটা শিশু কন্যাকে তিনি কুমারী জ্ঞানে পূজা করতেন। ১৯০১ সালে স্বামীজীর জীবনের শেষ কুমারী পূজা হয় বেলুড়মঠে। পূর্বে নবমীর দিন কুমারী পূজা হত, রাণী রাসমণি প্রতিবছর দুর্গাপূজায় কুমারী পূজার পর বারোশত কুমারীকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করাতেন এবং বেনারসি শাড়ি উপহার দিতেন। আসলে নারীজাতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দানের জন্য এই কুমারী পূজার আয়োজন।

সন্ধি পূজা : 'সন্ধি' শব্দের অর্থ মিলন। দুই বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে। লৌকিক জগতেও দুই পক্ষের মিলন ঘটনাকে সন্ধি বলে। এখানে দুই তিথি মিলন কালকে সন্ধি বলা হয়েছে। অষ্টমী তিথির শেষ ২৪ মিনিট ও নবমী তিথির প্রথম ২৪ মিনিটের এই ৪৮ মিনিট সন্ধি পূজার কালরূপে নির্দিষ্ট। এইখানে দেবীকে চামুণ্ডা রূপে পূজা করা হয়। শুম্ভ নিশুম্ভের দূত 'চণ্ডমুণ্ড' পর্বত দেশে অধিষ্ঠাতা দেবীকে গ্রহণ করার জন্য অগ্রসর হলে দেবীর মুখমণ্ডল ক্রোধে মসীবর্ণ হয়ে যায়। সেই দেবী চামুণ্ডাই কালী রূপে কথিত।

এই সন্ধিক্ষণে বলিদানের বিধান আছে। অনেকে পশুবলি দেন। বলি শব্দের অর্থ উপহার। জীবের অহংকার, ক্রোধ, কাম ইত্যাদি রিপুকে বিসর্জন দেওয়াই হল বলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

অবশেষে দশমী তিথির বিজয়া, বিসর্জন, নিরঞ্জন হয়। পূজক অন্তর থেকে যে দেবীকে প্রতিমায় ঘটে স্থাপন করে এই কদিন বাইরে পূজা নিবেদন করেছিলেন, বিসর্জন বা নিরঞ্জন কাজের মাধ্যমে তাকে নিজ অন্তরে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে থিতু হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সেবক মথুরামোহন বিশ্বাস জানবাজারে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। বিজয়া দশমীর দিনে বিসর্জনের মন্ত্র পড়ার পর পুরোহিত মধুরানাথের অনুমতি চাইলে তিনি দেবীকে বিসর্জন দিতে নারাজ হলেন, এদিকে সময় অতীত প্রায়। মধুরানাথ আদেশ দিলেন পূজা যেমন চলছে তেমনি চলবে। শাস্ত্রবাক্য অনুসারে দশমীতে দেবীর বিসর্জন কর্তব্য, ভক্তি ও স্বাস্থ্যবিধির বিরোধী শ্রীরামকৃষ্ণদেব মধুরানাথকে যা বলেছিলেন তা বিসর্জনের তাৎপর্যে স্মরণীয়। মধুরানাথ জানালেন তিনি প্রাণ থাকতে মাকে বিসর্জন দিতে পারবেন না। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—"ও এই ভয় তোমার? তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বললে? আর বিসর্জন দিলেই বা তিনি যাবেন কোথায়? ছেলেকে ছেড়ে মা কি কখনো থাকতে পারে? এই তিন দিন বাইরে দালানে বসে তোমার পুজো নিয়েছেন, আজ থেকে তোমার আরো নিকট থেকে সর্বদা তোমার

হৃদয় বসে তোমার পূজো নেবেন"। মধুরানাথ শান্ত হলেন শুধু তাই নয়, আমরা শ্রী ভগবানের মুখে এই শারদীয়া পূজার তাৎপর্যটা সহজ ভাষায় বুঝতে পারলাম।

বর্তমানে বারোয়ারি মণ্ডপের চেহারায় নানা শিল্পশৈলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন তাজমহলের খিলান, রাজস্থানের প্যাভিলিয়ন, পশ্চিমবাংলার পোড়ামাটি এছাড়া সুনামি ,আয়লা, ভূমিকম্প ইত্যাদি বিভিন্ন থিম তুলে ধরা হয়, যার শিল্পনৈপুণ্য প্রশংসনীয়।

(৩)

বিশ্বব্যাপী মাতৃসাধনায় বাঙালি জুড়েছে তার আবেগের গভীরতা। মানব সভ্যতার ধীশক্তি, কৃষ্টি, নন্দনতত্ত্ব প্রতিটির উদ্ভব ও পরিস্ফুটন মাতৃশক্তি ও মাতৃসাধনার হাত ধরে। পরে এই শক্তির সূত্রে সভ্যতা এগিয়ে গিয়েছে অগ্রগতির পথে। মায়ের কাছে শিশুর শিক্ষালাভের উৎকর্ষে মানব সভ্যতার ইতিহাস পেয়েছে অবিস্মরণীয় মাত্রা। আর 'মায়ের কোলে ঘুমায় ছেলে'— এই শান্তিই আমাদের পরম আকাঙ্ক্ষিত।

Revelations

উৎসারিত আলো

দ্রৌপদী মুর্মু : এক অনন্য নারীশক্তির প্রতীক

অতসী মহাপাত্র

সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ

ভারতবর্ষ হল বিপুল জনসংখ্যা বিশিষ্ট দেশ। এর মধ্যে একটি ব্যাপক অংশ জুড়ে রয়েছে আদিবাসী সম্প্রদায়। ভারতবর্ষের মধ্যে পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, ছত্রিশগড়, ওড়িশাসহ মধ্য ভারতের কিছু অংশ, পশ্চিমের মহারাষ্ট্র, গুজরাটের কিছু অংশ হল মূলত ভারতের আদিবাসী অধ্যুষিত রাজ্য। আদিবাসী জনগণের জীবন যুদ্ধের লড়াইটা আর পাঁচটা সমাজের মূলস্রোতে থাকা কিংবা কোনো কোনো পিছিয়ে পড়া সমাজ থেকে স্বতন্ত্র। কেননা, ভারতের আদিবাসীরা নানা সমস্যায় জর্জরিত। তাঁদের প্রধান সমস্যা হল স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী হিসাবে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার লড়াই তথা বেঁচে থাকার লড়াই। তাঁদের জীবন জীবিকার অন্যতম উৎস হল অরণ্য। ফলে বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, মহামারি প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। ভারতে বিভিন্ন জাতির আদিবাসী মানুষজন বসবাস করেন। ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবন-জীবিকা, সামাজিক অবস্থান সব দিক থেকেই পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়। তবে আদিবাসী সমাজে নারীরা সমান অধিকারের দাবিদার। পারিবারিক প্রেক্ষাপটে আদিবাসী নারীদের ক্ষমতায়নকে অকপটে স্বীকার করা গেলেও শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়নে আদিবাসী অনেকাংশে পিছিয়ে রয়েছেন। শিক্ষা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পিছিয়ে থাকার কারণে প্রশাসনের কিছু কিছু স্থানে আদিবাসী মহিলাদের উপস্থিতি আনুপাতিকভাবে অনেক কম। তবে কিছু কিছু স্বাধীনচেতা মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়। এই ব্যতিক্রমী ঘটনার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত লক্ষ্য যায় স্বাধীনতার ৭৫ বছরে। কারণ ভারতের ১৫তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি হলেন সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত। ইনি হলেন ভারতের প্রথম আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতি। বর্তমানে তিনি শুধুমাত্র সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নয়, সমগ্র বিশ্বের দরবারে তিনি হলেন সমগ্র ভারত ভূখণ্ডের প্রতিনিধি। তাঁর এই কৃতিত্বে সকল নারীরা সম্মানিত। তিনি হলেন সমগ্র ভারতবাসীর গর্ব।

দ্রৌপদী মুর্মু হলেন একজন ভারতীয় রাজনীতিবিদ, ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য এবং ভারতের ১৫তম রাষ্ট্রপতি। তিনি ১৯৫৮ সালের ২০শে জুন ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার গ্রামের সাঁওতাল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কেননা তাঁর জন্মের এবং বেড়ে ওঠার সময় উড়িষ্যা ছিল ভারতের পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলির মধ্যে একটি এবং সেখান থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের একজন মানুষের বিশেষ করে একজন আদিবাসী মহিলার উত্থানের ঘটনা খুব একটা সহজ ছিল না-- একথা সহজেই অনুমান করা যায়। শোনা যায় আগামী বছরের জুন মাস পর্যন্ত তাঁর জন্ম যে গ্রামে সেখানে বিদ্যুৎ ছিল না। রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা হওয়ার পরে দ্রুত গতিতে সেই গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ঠাকুরমার নাম অনুসারেই নাতনির নাম দেওয়া হবে এই ছিল সাঁওতাল সমাজের রীতি। আদিবাসী ঘরে যখন কোন মেয়ে জন্মায় সে তার ঠাকুরমার নাম গ্রহণ

করে। আর যখন কোন ছেলে জন্মায় তখন তার নাম রাখা হয় দাদুর নামে। এইভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আদিবাসী সমাজে নামের অস্তিত্ব বজায় থাকে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, সংবাদসংস্থা পিটিআই এর প্রতিবেদন অনুযায়ী সম্প্রতি এক ওড়িশা ম্যাগাজিনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, দ্রৌপদী তাঁর আসল নাম নয়। তাঁর সাঁওতালি নাম পুঁটি। দ্রৌপদী নামটি তাঁর একজন শিক্ষিকা দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অন্য জেলার বাসিন্দা। ময়ূরভঞ্জ জেলাটি মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত। বালাসোর ও কটক থেকে শিক্ষকরা এই জেলায় পড়াতে আসতেন। স্কুল শিক্ষিকা বাইরের একজন জেলা থেকে এসেছিলেন। পুঁটি নামটি তাঁর পছন্দ হয়নি। ভালোর জন্যই তিনি সেটা বদলে দ্রৌপদী রেখেছিলেন। বর্তমান ভারতীয় প্রেসিডেন্ট আরো জানিয়েছেন যে, বেশ কিছু মুখে মুখে তাঁর নাম অনেকবার বদলেছে। 'দ্রৌপদী' এই শব্দটিও বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়েছে। তিনি বলেন, দ্রৌপদী মুর্মু এই নামে সকলের কাছে খ্যাত হলেও, তাঁর আদি নাম পুঁটি কখনো হারিয়ে যাবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর পিতা এবং ঠাকুরদা ছিলেন গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান। ছাত্রজীবনে গ্রামেই বিদ্যালয়েই পড়াশোনা শুরু হয় ছোট্ট দ্রৌপদীর। তিনি পড়াশোনায় খুব ভালো ছিলেন; এবং খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে ছিলেন। গ্রামের বিদ্যালয়ের প্রথা অনুযায়ী ক্লাসের প্রথম স্থানাধিকারীকে 'মনিটর' করা হবে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একটি মেয়েকে মনিটর হিসেবে প্রথমে মেনে নেওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু ওই অল্পবয়সেই লড়াই করে ছোট্ট দ্রৌপদীর নিজের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এরপর ভুবনেশ্বরে পাড়ি দিয়েছিলেন স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করার জন্য। সেখানে তিনি রমাদেবী উইমেন্স কলেজে কলা বিভাগে স্নাতক হন। তারপরে নিজের যোগ্যতায় চাকরি পেয়ে যান। পরবর্তীকালে রাজ্য রাজনীতিতে আসার পূর্বে দ্রৌপদী একজন স্কুল শিক্ষক হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন। তিনি অরবিন্দ ইন্টিগ্রাল এডুকেশন এন্ড রিসার্চ নামে রায়রংপুরের এক প্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক এবং ওড়িশা সরকারের সেচবিভাগে জুনিয়র সহকারি হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ১৯৯৭ সালে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন এবং রায়রঙ্গপুর নগর পঞ্চায়েতের কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির তপশিলি উপজাতি মোর্চার জাতীয় সহ-সভাপতি হিসেবে কাজ করেছেন। ওড়িশায় ভারতীয় জনতা পার্টি এবং বিজু জনতা দলের জোট সরকারের সময় তিনি ৬ই মার্চ ২০০০ থেকে ৬ আগস্ট ২০০২ পর্যন্ত বাণিজ্য ও পরিবহন এবং ৬ আগস্ট ২০০২ থেকে ১৬ই মে ২০০৪ পর্যন্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্বের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। এছাড়াও, তিনি হলেন ২০০৪ সালে রায়রঙ্গপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক। উড়িষ্যা বিধানসভায় তিনি সেরা বিধায়কের জন্য 'নীলকণ্ঠ' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন ঝাড়খণ্ডের প্রথম মহিলা রাজ্যপাল। ১৮মে ২০১৫ সালে তিনি ওড়িশা থেকে প্রথম মহিলা আদিবাসী নেত্রী যিনি ভারতীয় রাজ্যের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ২০১৭ সালের সংশোধনী প্রস্তাব ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় পাশ হলেও তাতে অনুমোদন দেননি দ্রৌপদী, কারণ ওই সংশোধনীতে বলা হয় আদিবাসীরা নিজের জমি বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবেন এবং এতে আদিবাসীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে পারে। তিনি এর পূর্বে ২০১৫ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডের

নবম রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। উড়িষ্যা রাজ্য থেকে আসা দ্রৌপদী হলেন ঝাড়খণ্ডের প্রথম রাজ্যপাল যিনি পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেন এবং প্রথম তপশিলি উপজাতির অন্তর্গত ব্যক্তি, যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত হন। ২০২২ সালের জুলাই মাসে বিজেপি ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে অনুষ্ঠিতব্য ২০২২ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভারতীয় গণতান্ত্রিক জোটের প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকে মনোনীত করেছিল। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাঁর বিরোধী দলের নেতা ছিলেন যশবন্ত সিনহা। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরে পৃথিবীর সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের পঞ্চদশ রাষ্ট্রপতি হিসেবে ২৫শে জুলাই শপথ নিলেন দ্রৌপদী মুর্মু। জীবন যুদ্ধে হার না মানার মানসিকতা, এক অদম্য জেদ আর কঠোর পরিশ্রমের অধিকারী আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায় থেকে আগত প্রথম মহিলা, যিনি গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ পদটি অধিকার করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে খুবই কষ্ট পেয়েছেন তবুও তিনি কোনদিন ভেঙে পড়েনি। কলেজ জীবনে তিনি শ্যামচরণ মুর্মুর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং পরবর্তীকালে তিন সন্তানের জননী হন। কিন্তু ২০০৯ সালে পরিবারের ঘনিয়ে আসে বিষাদের ছায়া যখন তাঁর বড়ো ছেলে লক্ষণের আকস্মিক মৃত্যু সংঘটিত হয়। এর ফলে চরম বিষাদ গ্রাস করে দ্রৌপদীকে। কিন্তু তিনি ভেঙে পড়েননি। লড়াই চালিয়ে গেছেন। জীবন যুদ্ধের এক কঠিন লড়াই। তাই আশ্রমের 'সহজ যোগ' এর মাধ্যমে বদলে ফেলেন নিজের জীবনযাপন। কিন্তু বাস্তব বড়ই কঠিন এবং নির্মম। বছর চারেক বাদে আবার তিনি মানসিক আঘাত পান ছোট ছেলে শিপুনের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কারণে। শুধু তাই নয় এই যন্ত্রণায় যুক্ত হয় প্রায় মাসখানেকের মধ্যে তাঁর মা এবং ছোটো ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনা। এমনকি পরের বছরেই দীর্ঘদিনের জীবনসঙ্গী স্বামীকে হারান তিনি। এইভাবে পরিবারের পাঁচ সদস্যকে হারিয়ে আধ্যাত্মিকতার পথ বেছে নেন দ্রৌপদী। কিন্তু জীবন গতিশীল। সে কখনো থেমে থাকে না। তাই জীবনে প্রতিনিয়ত ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমেই সে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। এই ঘাত-প্রতিঘাতে এগিয়ে যাওয়াই হল জীবন। আর 'থেমে যাওয়া' বা 'হেরে যাওয়া'র অর্থ পরাজিত হওয়া। কিন্তু দ্রৌপদী মুর্মু জীবন অভিধানে 'থেমে যাওয়া' কথাটি পাওয়া যায় না।

রাজনীতি তো বটেই, এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত থেকেছেন। তিনি ইতিমধ্যে জনস্বার্থে পাহাড়পুরের জমি দান করেছেন। স্বামী এবং সন্তানদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শুরু করেছেন আদিবাসী ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে শিক্ষাদানের জন্য একটি স্কুল। ব্যক্তিগত জীবনে অনেক কিছু হারিয়েও তিনি এক নতুন জীবন পথ বেছে নিয়েছেন, যে পথ তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল জন্মস্থান উড়িষ্যার বাইদাপসি থেকে দিল্লির রাইসিনা হিলসে তথা রাষ্ট্রপতি ভবনে, যেখানে পঁচিশে জুলাই ২০২২ ভারতের পঞ্চদশ রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন দ্রৌপদী মুর্মু। ভারতের ১৫তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেওয়ার পর নিজের বক্তব্য পোষণ করার সময় দ্রৌপদী জানিয়েছেন তাঁর রাষ্ট্রপতি হওয়া প্রতিটি নারীর স্বপ্ন ও সামর্থ্যের প্রতিফলন। এদিন রাষ্ট্রপতি সংসদের সেন্ট্রাল হলে দাঁড়িয়ে তিনি আরো বলেন তাঁর কাছে এটা সবচেয়ে সন্তোষজনক যে যারা বছরের পর বছর উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত ছিলেন সেই

দরিদ্র, দলিত পিছিয়ে পড়া আদিবাসীরা আমাকে তাদের প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর মনোনয়নের পেছনে দরিদ্রদের আশীর্বাদ হয়েছে, এটি কোটি কোটি নারীর স্বপ্ন ও সামর্থের প্রতিফলন স্বরূপ।

প্রসঙ্গত বলা যায়, সংসদে ভারতের প্রধান বিচারপতি শপথ বাক্য পাঠ করেছিলেন দ্রৌপদী মুর্মুকে। তিনি দেশের দ্বিতীয় মহিলা রাষ্ট্রপতি এবং সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত প্রথম আদিবাসী মহিলা। এর পাশাপাশি স্বাধীন ভারতে জন্ম নেওয়া প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন দ্রৌপদী। এই পদে আসীন হয়ে তিনি জানিয়েছেন "সমস্ত ভারতীয়দের প্রত্যাশা আকাঙ্খা এবং অধিকারের প্রতীক- সংসদের দাঁড়িয়ে আমি বিনীতভাবে আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনাদের বিশ্বাস এবং সমর্থন এই নতুন দায়িত্ব পালনের জন্য আমার কাছে বড় শক্তি হবে"। এইদিন তিনি আরো বলেন 'আমি সৌভাগ্যবান যে স্বাধীনতার ৭৫তম বছরে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমার পদোন্নতি শুধু আমার নয়, দেশের সকলের কৃতিত্ব। প্রতিটি দরিদ্র মানুষ, প্রতিটি প্রান্তিক মানুষ আমাকে এই পদক্ষেপে আশীর্বাদ করেছেন এবং তাই আমি সম্মানিতবোধ করছি। আমি নারী ও যুবকদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, তাদের স্বার্থ আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ'। এদিন তিনি নিজের আদিবাসী ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরে বলেন, 'আমি সেই আদিবাসী ঐতিহ্যে জন্মগ্রহণ করেছি যা হাজার হাজার বছর ধরে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবন চালিয়ে গেছে। আমি আমার জীবনকালে বনজঙ্গল ও জলাশয়কে সামনে থেকে উপলব্ধি করেছি। আমরা প্রকৃতি থেকে সম্পদ গ্রহণ করি এবং সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রকৃতিকে সেবা করি।'

দ্রৌপদী মুর্মুর এই মনোবল ও জীবনাদর্শ পৃথিবীর প্রত্যেকটি নারীর কাছে এক অনুপ্রেরণা প্রদান করবে। তিনি হলেন নারীশক্তির প্রতীক। রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্বাধীনতা ৭৬তম দিবসের প্রাক্কালে প্রথম বক্তৃতায় দ্রৌপদী মুর্মু বঞ্চিত গরীব এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষদের প্রতি সংবেদনশীলতা ও করুণাকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলেছেন। দেশের প্রথম আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতি বলেছেন, দেশের নতুন আত্মবিশ্বাসের উৎস এখন তরুণ প্রজন্ম কৃষক ও মহিলা। তাঁর বক্তব্য দেশে মহিলা ও পুরুষের বৈষম্য কমছে। সামাজিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশীদারিত্ব বাড়ছে। পঞ্চায়েতে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা ১৪ লক্ষ পেরিয়ে গেছে। কমনওয়েলথ গেমসে মেয়েরা সাফল্য পেয়েয়েন। মেয়েদের অনেকে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণি থেকে উঠেছেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর জীবনকাহিনী যেকোনো নারীকে জীবন যুদ্ধে হার না মেনে এগিয়ে যাওয়ার এক অদম্য মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করবে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীনযুগে মহাভারতের সময় থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের দ্রৌপদীরা হলেন আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। তাঁরা (নারীরা) আমাদের জীবনে স্থান-কাল–পাত্র নির্বিশেষে বিভিন্ন ভূমিকায় ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিতি রয়েছেন। কখন সে স্নেহদায়িনী মা, কখনো স্ত্রী, কখনো আদরের বোন, আবার কখনো সে কন্যা, আবার গৃহের বাইরে একজন উপকারী বন্ধু, অফিসের সহকর্মী, কখনোবা জীবনের গুরুত্ব ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিত্ব আবার কখনো অনুপ্রেরণাদায়ী। এইভাবে পরিবারে এবং সমাজে দ্রৌপদীরা বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে চলেছেন। শুধু তাই নয়, স্বাধীন ভারতে নারীরা

শিক্ষা, খেলাধূলা, রাজনীতি, শিল্প, সংস্কৃতি, গণমাধ্যম, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি সবক্ষেত্রেই পূর্ণরূপে অংশ গ্রহণ করেছে। এমনকি বর্তমান যুগে নারীরা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার অধ্যক্ষ, বিরোধী দলনেতা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক প্রভৃতি নানা গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেছেন। তবে একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হয় যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা তাদের সম্মান জানাতে পেরেছি আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা চরম শোষণ লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার। পারিবারিক প্রতিহিংসা কিংবা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের লাঞ্ছনা বঞ্চনা নানা উদাহরণ স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিরাজমান। আমরা যদি আমাদের চারপাশে থাকা দ্রৌপদীদের জীবনে চলার পথে একটা ধাপ এগিয়ে যেতে সাহায্য করি, তাহলে ভারতবর্ষের সমাজও হয়তো আরো একধাপ অগ্রগতির পথে যেতে পারে; আর সেটাই হবে সকল ভারতবাসীকে দেওয়া আমাদের স্বাধীনতার ৭৫-এর শ্রেষ্ঠ উপহার।

Mirror of Life

আয়নামহল

‘ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে’

রঞ্জনা গাঙ্গুলী (মুখার্জী)
সহযোগী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ

চাবি শব্দটি ছোটো, মাত্র দু’অক্ষরের কিন্তু এর গুরুত্ব অনেক। এর আকৃতি যাইহোক না কেন উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই-- বন্দিত্ব থেকে মুক্তিদান। কিন্তু সেই চাবিই যদি কখনও হারিয়ে যায় তাহলে... ছোটোবেলা থেকেই এই চাবি আমার জীবনের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে গেছে। তখন আমার বয়স হবে আড়াই কি তিনবছর। আমার ঠাকুমা গিয়েছিলেন তীর্থে। ঠাকুমা ছিলেন নিষ্ঠাবতী বিধবা, আবার ঘোরতর বৈষ্ণব। তাই তিনি নিজের সংসারকে আমাদের যৌথসংসার থেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন। নিজের রান্না নিজেই করতেন। তাই যদি ছোঁয়াছুয়ি হয়ে যায় সেই ভয়ে নিজের গৃহস্থালি তালা লাগিয়ে যেতেন। তবে চাবিটা আমাদের কাছেই থাকত। এবার তীর্থ সেরে ফিরে এসেছেন ঠাকুমা, কিন্তু ঘরে ঢুকবেন কী করে? চাবি তো উধাও। মা-জেঠিমারা তো তটস্থ। কী হবে এখন? উলটেপালটে সব জিনিস দেখা হচ্ছে। কিন্তু কোথায় চাবি? কী সমস্যা! ছোট্ট আমি কিন্তু বলে চলেছি চাবি আছে হিলনোরা জুতোর ভেতর। কেউই গুরুত্ব দিচ্ছে না। বাচ্চা মানুষ কী বলতে কী বলে চলেছে। কিন্তু শেষে জেঠিমা বললেন ‘দেখিতো নতুন কেনা হিল তোলা জুতোর বাক্সটা’। ঠিক ওই তো চাবি। সে যাত্রায় মান বাঁচানো গেল।

আর একটু বড়ো হবার পর মায়ের সঙ্গে গেছি পুজোর বাজার করতে। এক জামাকাপড়ের দোকানে গিয়ে বিভিন্ন ডিজাইনের জামা দেখতে দেখতে এতই মোহিত যে বাড়ির চাবি দোকানে ফেলেই চলে এলাম। বাড়ি ফিরে যখন খেয়াল হল যে চাবি নেই তখন কিন্তু কিছুতেই ঠিক মনে পড়ছে না ঠিক কোথায় ফেলেছি। মোটামুটি একটা অনুমান করে জামার দোকানটাতে আবার গেলাম। কিন্তু কী কাণ্ড! দোকান তো বন্ধ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যখন ফিরে আসছি তখন হঠাৎ উল্টোদিকের দোকান থেকে একজন ডেকে বললেন ‘আপনারা কি চাবি খুঁজছেন?’ কী আশ্চর্য! উনি কী করে জানলেন? তখন উনি বললেন যে উনি আমাদের চেনেন। তাই যখন জামার দোকানটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল উনি চাবিটি রেখে দিয়েছিলেন। আমরা ওনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে এলাম।

এরপরের ঘটনা আরো পরের। ছোটোমাসির বাড়ি দোল উৎসবে গেছি সবাই মিলে। আমি একটু আগেই পৌঁছে গেছি। বাড়ির সকলে কিছু পরে বাড়িতে তালা দিয়ে গেছে। ফেরার সময় আমার মাসতুতো বোন আমাকে দিতে চাইছে একটা চাবি। কিন্তু কেন? আমি কেন চাবি নেব? যারা পরে তালা দিয়ে গেছে তাদের কাছেই তো চাবি আছে। সুতরাং নির্দ্বিধায় বেরিয়ে পড়লাম মাসির বাড়ি থেকে। কিন্তু তারপরেই উপস্থিত হল আসল সমস্যা। বাড়ি এসে দেখা গেল চাবি তো নেই! কী হবে এবার? ‘গরীবের কথা বাসি হলে দামি হয়’ এই প্রবচনের সত্যতা এখন অনুভব করলাম। মাসতুতো বোন এত করে চাবিটা দিতে চাইল...ভালো করে দেখলাম না পর্যন্ত!

কনফিডেন্সের সঙ্গে ওর অনুরোধ উপেক্ষা করলাম। নিজের বোকামিতে নিজেরই হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছিল। যাহোক কোনোরকমে পাশের বাড়ি থেকে চাবির গোছা থেকে একেকটা চেষ্টা করতে করতে একসময় খোলা গেল দরজা।

এরপরের ঘটনা খুবই সাম্প্রতিক। চাকরিসূত্রে তখন দুর্গাপুরে অবস্থান। ক্যাম্পাসের মধ্যেই থাকি। তিনতলায় আমার ফ্ল্যাট। কলেজে পরীক্ষা। আমার কাছে প্রশ্নপত্রের আলমারির চাবি। ৯.৩০টার মধ্যে কলেজে ঢুকতে হবে। চটপট রেডি হয়ে নীচে নেমে দেখি মূল দরজায় তালা দেওয়া। কী হবে এবার? এই তালাটা তো নীচের গেটে দেওয়া হয় না...। আমার কাছে তো এই তালাটার চাবি নেই।এক চাবির দায়িত্ব নিয়ে আরেক চাবিতে বন্ধ আমি। ফোন করতে গিয়ে দেখি ফোনে টাওয়ার নেই। হায় ভগবান! সময় তো গড়িয়ে যাচ্ছে। টাওয়ার আসতেই ফোন করলাম। একজন এসে চাবি নিয়ে গেল। দায়িত্ব থেকে তো মুক্ত হলাম কিন্তু নিজেকে মুক্ত করব কীকরে? তারপর একে একে এলেন কয়েকজন সহকর্মী। সঙ্গে তালা ভাঙার দক্ষ লোক। বহু চেষ্টার পর জাব্দা তালা জব্দ হল, আমিও মুক্ত হলাম। সমস্যামুক্ত হবার পর পুরোনো ঘটনা মনে পড়লে বেশ মজাই লাগে, হাসিই পায়। কিন্তু কিছু ঘটনা বোধহয় তার স্মৃতি দগদগে ঘায়ের মতো হয়ে রয়ে যায়। যেমন স্টিফেন হাউসের স্মৃতি। আগুন লেগে যাওয়ার পর বহু মানুষ নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলেন। কিছুলোক বেরোবার জন্য ছাতের দরজার দিকে গেছিলেন। কিন্তু তা ছিল তালাবন্ধ। চাবি গিয়েছিল হারিয়ে। অসহায়ের মতো সর্বশক্তি দিয়ে তালা খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু নিয়তি তাঁদের সাহায্য করেনি। জীবন্ত দগ্ধ হয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

এবছর আমরা স্বাধীনতার ৭৫ বছর পালন করেছি। পরাধীনতার তালা ভেঙে বহু শহীদের প্রাণের বিনিময়ে পেয়েছি এই স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার সম্মানরক্ষা আমাদের সবার কর্তব্য। আজকে আমরা শপথ নিই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক সুস্থ সুন্দর দেশ তথা সমাজ গড়ার।

জীবনস্মৃতি

রত্না মাইতি
দর্শন বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

লেখা আসলে কথা বলা। আমি এই সামান্য লেখার মাধ্যমে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। নিজের কথা। হয়ত আমার মতো অনেক মেয়ের কথা।

গ্রামে জন্ম আমার। দরিদ্র পরিবারে। বাবা কাজের জন্য বাইরে শহরে থাকতেন। অভাবের সংসার। মা আমাকে একাই মানুষ করেছেন। আমার খুব ইচ্ছে ছিল নাচ, গান কিংবা আবৃত্তি শেখার, কিন্তু অর্থের অভাবে সেটা আর সম্ভব হয়ে উঠল না। সবার সব ইচ্ছে তো পূর্ণ হয় না।

বড়ো হলাম। মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হলাম। বাবা-মায়ের স্বপ্ন ছিল ভালো পাত্র দেখে আমার বিয়ে দেবে। হঠাৎ একদিন, একজন পাত্রের সন্ধান নিয়ে এল। বাবা-মা আমাকে পাত্রের সম্বন্ধে জানালেন। আমার ইচ্ছে ছিল বি.এ পাশ করার, তাই প্রথমে বিয়ের জন্য রাজি হচ্ছিলাম না। আমার আপত্তির কথা শুনে পাত্রের বাড়ি থেকে জানাল যে, আমাকে বিয়ের পর পড়াশুনো করতে দেবে এবং মেয়ের মতো রাখবে। আর বাবা-মাও বোঝাল-- ভালো পাত্র বিয়ে করে নে। অগত্যা রাজি হয়ে গেলাম।

বাবা কোনো ত্রুটি না রেখে ধুমধাম করে আনুষ্ঠানিক ভাবে আমার বিয়ে দিল। পরের দিন আমি শ্বশুর বাড়ি চলে গেলাম। কয়েকদিন পর কলেজে যাব একথা শাশুড়িকে জানালাম। তিনি বললেন—আমার ছেলেকে জানাও। স্বামীর কাছে গিয়ে বললাম—কাল কলেজ যাব। তখন সে তীব্র মেজাজের সঙ্গে উত্তর দিল--কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, বাড়ির বউ বাড়িতে থাকো। এরকম বলার কারণ আমি কিছুই অনুধাবন করতে পারলাম না। পড়াশোনা তো অনেক দূর, বাড়ির বাইরে যাওয়াও নিষেধ করল শ্বশুরবাড়ির লোকজন। এভাবে কেটে গেল কয়েকদিন।

একদিন স্বামী মদ্যপান করে বাড়ি ফিরেছে এবং তারপর আমাকে মারধর করেছে। আমার কোনো অসুবিধা কিংবা কষ্টের কথা শাশুড়িকে বলতে পারতাম না কারণ তিনি তো আমাকে বাড়ির চাকরের থেকেও খারাপ ব্যবহার করতেন। এরকম কত অত্যাচারের কথা ভয়ে কাউকে বলতে পারতাম না। একদিন সাহস করে স্বামীকে প্রশ্ন করলাম--আমার সাথে এমন ব্যবহার কেন করো, নেশা করে বাড়ি কেন ফেরো? এ কথা তো বিয়ের আগেই জানাতে পারতে। তখন সে উত্তর দিল-- নেশা করা ছেলে জানলে তোর বাবা-মা আমার সাথে কি বিয়ে দিত?

বাবা মাকে তাও কিছুই জানাইনি। বাবার সম্মানের কথা ভেবে মুখ বন্ধ করে সংসার করছিলাম। কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন আমাকে দেখার জন্য বাবা হাজির হলেন এবং গিয়ে দেখতে পেলেন মেয়ে দাসীর মতো পরিশ্রম করছে এবং জামাই মদ্যপান করে বিছানায় শুয়ে আছে। তা দেখে আমার বাবা আমাকে বাড়ি নিয়ে চলে এলেন। তারপর বাবা-মা সিদ্ধান্ত নিলেন আমাকে ওই অত্যাচারী শ্বশুরবাড়িতে আর পাঠাবেন না।

বাবা-মা-আমি সকলে মিলে কাঁদতে লাগলাম। কিন্তু এই চোখের জলে মিশে ছিল পরম আশ্রয়ের আনন্দ।

আমার মা বলল--স্বনির্ভর হয়ে দেখিয়ে দে তুই। ওই অত্যাচারী পরিবারে থাকার চেয়ে একা থাকা অনেক ভালো। মায়ের কথা শুনে আমার জেদ বেড়ে গেল, আবার পড়াশোনা শুরু করলাম নতুন উদ্যমে। আর এখন একটা কাজও করছি তার সঙ্গে। বর্তমানে আমি পরিবারকে নিয়ে অনেক সুখে ও আনন্দে আছি।

Writing the Self

আত্মকথা

আমাদের মেয়েদের প্রতি

ইনা ধর রায় দাশগুপ্ত
সহযোগী অধ্যাপিকা, ভূগোল বিভাগ

২০১৬ সালে আগস্ট মাস, ২৯ বা ৩০ তারিখ। নতুন কর্মক্ষেত্র নিমতৌড়ি সরকারি কলেজ, যেখানে শুধু মেয়েরা পড়তে আসে। কলকাতার মেয়ে, বিগত দশ বছর কলকাতার বাইরে কাজ করে চলতে চলতে আবার ট্রান্সফার, গন্তব্য তমলুকের কাছে নিমতৌড়ি। দিনটা ছিল শনিবার। চারদিকে ঝুপঝুপে বৃষ্টি। কলেজ প্রাঙ্গন প্রায় ফাঁকা। দু-একজন পূর্বপরিচিত থাকলেও তারাও সেদিন অনুপস্থিত। একরাশ বিরক্তি নিয়ে নতুন গন্তব্যের সম্বন্ধে মাথায় রাখা মানসিক মানচিত্র নিয়ে প্রথমবারের মতো কলেজে প্রবেশ।

কলেজ চত্বরে পা দিয়ে সবচেয়ে ভালো লেগেছিল সাদা ঝকঝকে ফ্লোরটা। নতুন কলেজ, একতলা বিল্ডিং। আধো-অন্ধকার বৃষ্টিভেজা দিনের সেই অদ্ভুত আবহ আর আমি একরাশ বিরক্তি আর কৌতূহল নিয়ে সাদা ঝকঝকে করিডর ক্রস করতে করতে অফিসের দিকে যাচ্ছি। মানসিক মানচিত্রের সঙ্গে যার কোনো মিল ছিল না। দিনটা কোনোমতে কেটে গেল, আমিও জয়েন করে গেলাম নতুন কলেজে।

সবকিছু অদ্ভুতভাবে বদলাতে লাগল অতিদ্রুত। নতুন পরিবেশ, বেশিরভাগ নতুন মানুষ। একটু আড়ষ্টতা, সবকিছু চিরকালের মতোই এক নিমেষে কেটে গেল ক্লাসরুমে ঢুকে। কয়েকদিনের মধ্যেই মেয়েদের সাথে বেশ ভাব হয়ে গেল। লক্ষ্য করলাম মেয়েরা কলেজে আসে যায়, একটু পড়ে, একটু পড়ে না, কিন্তু কোথাও যেন এদের সুরতাল সব কেটে গেছে। মাসখানেক যেতে যেতেই দেখলাম পড়াশুনোটা বেশিরভাগের কাছেই একটা ডিগ্রি পাওয়া বা টাইম পাস। বাড়ির কাছের কম মাইনের সরকারি কলেজ, স্কলারশিপ, কন্যাশ্রী ইত্যাদির জন্যেই আসা। কোনো বড় কিছু লক্ষ্য নেই, কোনো ইচ্ছা নেই, অনেকের মনের ভাব প্রকাশের ভাষাও নেই। মাঝে মাঝে লক্ষ করলে দেখা যায় কাল যে ডাল খালি ছিল আজ সেখানে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, কাল যে ছটফটে ফিল্ডের কাজ করা ছোট্ট মেয়ে ছিল আজ সে মা হতে চলেছে। প্রতিটা ক্লাস, প্রতিটা দিন তাদের ভেতরে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা।

মনের ভিতরের প্রশ্নটা আরো তীব্র হয়ে প্রত্যাঘাত করে। নারীজন্ম কীসের জন্য? তবে সেই যে শিশুকাল থেকে আলোর উদ্দেশ্যে এত যুদ্ধ তা কি সঠিক পথ নয়? কিন্তু যে মা অশিক্ষিত সে তার সন্তানকে কী শিক্ষা দেবে? যে নারী অর্ধশিক্ষিত, সে একটা সুন্দর সংসার-সমাজ কেমন করে গড়বে? এত মমতা, ভালোবাসা আর তেজ সব চাপা যাবে?

সিস্টার নিবেদিতার বাণী মনে পড়ে যায়—
“It is her awakened sense of responsibility. It is her love and pity for her own people, and the wisdom with which she considers their interests, that marks her out as modern and cultinated and great.’

শিক্ষাদীক্ষা, খাদ্য; সুস্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে লাভ না করলে কোনো নারী তথা মানুষ সম্পূর্ণ হতে পারে না। সম্পূর্ণতা প্রাপ্তি না হলে সে তার চেয়ে বেশি সংসারের, সমাজের তথা দেশের তথা সমগ্র জগতের। কত অমূল্য একটি সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়া—এ যে বড় যন্ত্রণার। মানবিক দক্ষতা ছাড়া যে কোনো কাজ সম্ভব নয়।

"Efficiency to all the circumstances of life, this womanhood before wifehood and humanity before womanhood, is something which the education of the girl must aim at every age."— সিস্টার নিবেদিতা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, সিস্টার নিবেদিতা আমাদের মেয়েদের অন্ধকার জগৎকে আলোয় ভরিয়ে তুলেছিলেন। তাঁদের সমস্ত সম্বল দিয়ে মেয়েদের স্কুল গড়েছেন দিকে দিকে। সে কি শুধুই স্কুল-কলেজ গড়ার জন্য? তাঁদের দেশের মেয়েরা কি তবে অর্ধশিক্ষিত হয়ে থেকে যাবে?

আমাদের মেয়েরা শান্ত আলোর মতো, তাদের আলোর তেজ দেখা যায় না। চারদিক দিয়ে এক অদৃশ্য আবরণ দিয়ে তাদের ঘিরে রাখা আছে। সে আবরণ মুক্ত হয়ে শিক্ষার আগুনে তাকে উষ্ণ করে তুলতে পারলেই তারা সূর্যের মতো শক্তির উৎস হয়ে উঠবে এবং তারাই একদিন দেশোদ্ধার করবে।

২০১৬ থেকে ২০২২ শেষ হতে চলল। একটু একটু করে অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। ওদের স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ-পছন্দ বদলাতে শুরু করেছে। সাফল্যের আস্বাদ, লক্ষ্যের ঝলকানি অল্প অল্প করে ভেঙে দিচ্ছে আগল। আবরণ খসে পড়ছে একটা একটা করে। আরো আলোর প্রয়োজন, প্রয়োজন আরো শক্তির। হাত ধরে আলোর পথ দেখাতে হবে আমাদের, তারপর একদিন আর হাত ধরতে হবে না। ওরাই এগিয়ে দেবে পরবর্তী প্রজন্মকে আলোর অভিমুখে।

গুরুপ্রণাম

পায়েল দোলাই

পদার্থবিদ্যা বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

"অজ্ঞান তিমিরান্ধ্যস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মই শ্রী গুরবে নমঃ নমঃ।।"
অজ্ঞান আঁধারে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে আলোয় নয়ন যাঁরা ভরালেন, প্রণমি তাঁদের চরণে, আমি প্রণমি তাঁদের চরণে, আমি প্রণমি তাঁদের চরণে।

গাছ যেমন কত পক্ষীকে ছায়া প্রদান করে, নীড়ের জায়গা করে দেয়, ঠিক তেমনি শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ফর উইমেনও শত শত আমাদের মতো ছাত্রীদের (পাখিদের) ছায়া (শিক্ষা) প্রদান করে এবং কয়েক বছরের জন্য পড়াশোনার জায়গা করে দেয়। এবং এসব পরিচালনার জন্য যাঁর অবদান, তিনি হলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. বিজয়কৃষ্ণ রায়। হ্যাঁ, স্যার আমাদের কাছে সত্যিই 'কৃষ্ণ' অর্থাৎ 'ভগবান তুল্য' এবং উনি আমাদের মন জয় করতেও পেরেছেন তাই উনি বিজয়স্বরূপ। তাঁর আন্তরিক পরিশ্রমের দ্বারা গড়ে ওঠা এই সুন্দর প্রতিষ্ঠানের অংশ হয়ে উঠতে পেরে আমি খুবই কৃতজ্ঞ।

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীকে আমার প্রণাম। তাঁদের বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রথমেই পদার্থবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তথা মহাদেব বাবুর জন্য কিছু বলতে ইচ্ছে করছে। স্যার যে শুধু নামেই মহাদেব তাই নয়, কাজেও তিনি অগ্রগণ্য। ওঁর সহানুভূতিশীল আচরণ মনে রাখার মতো। যেকোনো টপিককে সহজ ভাষায় বোঝানো স্যারের সবচেয়ে বড়ো গুণ। সবসময় হাসির উপাদান মজুত থাকে মুখের ভাষায়। স্যারকে প্রণাম জানাই।

আজকে আমরা কলেজের পোর্টালকে যেভাবে দেখতে পাই তার বেশির ভাগটাই সায়ন স্যারের হাতে সুন্দর করে সাজানো। কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের এবং বিভিন্ন স্থানের ছবি সংগ্রহ করে তাকে এরকম একটা রূপ দেওয়ার জন্য স্যারকে অনেক অনেক সাধুবাদ জানাই। আর যদি স্যারের শিক্ষণশৈলীর কথা বলি তাহলে আমার জীবনের প্রথম কোনো শিক্ষক পেলাম যিনি সবসময় এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন। এবং সারা বোর্ড জুড়ে লিখে গোটা কয়েকটা চক এক-একটা ক্লাসেই শেষ করে দেন। স্যারের বিষয় বোঝানোর ধরন সম্পূর্ণ আলাদা এবং প্রায়োগিক গাইড হিসেবেও তিনি অতুলনীয়।

পিয়াসী বিশ্বাস ম্যামের উপর তো 'বিশ্বাস' রয়েছে সকলেরই। যদি খুব সংক্ষেপে কিছু সময়ের মধ্যেই কোনো টপিক পুনঃপাঠ করতে হয় তবে ম্যামের পড়ানোর উপর বিশ্বাস রাখতেই হয়। তাঁর বন্ধুর মতো আচরণে আমরা সত্যিই কৃতার্থ। ম্যাম সাক্ষাৎ 'ছাত্রবন্ধু'।

পর্ণা ম্যামের সম্পর্কে কী বলব ভেবেই পাচ্ছি না কারণ কোথা থেকে শুরু করব আর কোথায় শেষ করব, খুঁজে পাচ্ছি না কিছুতেই। তবে প্রথম দিনের ক্লাস থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ম্যামের একটাও ক্লাসে যদি মিনিট খানেক দেরিতে যোগ দিই, বোধহয় একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

শুনতে পেলাম না। আর ম্যামের কণ্ঠের প্রশংসা আমি সারাজীবন করব। ম্যামের গলায় একটা গান শোনার ইচ্ছে রইল।

রসায়নের রসের খবর পেতে হলে তো IITian রথীন বাবুর কাছেই যেতেই হয়। স্যারের সদা সর্বদা হাসিমুখ আর আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো কথা বলা কার না ভালো লাগে।

অন্যদিকে, মিতালি ম্যামের কঠোরতাকে কে না ভয় করে! তবে ম্যাম মন থেকে খুব একটা রাগী নন জানি। কলেজ ও ভর্তির শত ঝামেলার মোকাবিলায় ম্যামের এই কঠোরতার প্রয়োজন ছিল বইকি। ম্যামের ক্লাসে সুন্দর করে কেমিস্ট্রি পড়ানোর কথাও একইসঙ্গে বলতে হয়।

সায়ন্বিতা ম্যামের অসাধারণ নাচে মুগ্ধ সকলেই। আমার জীবনের প্রথম কোনো ম্যামকে কলেজের যে কোনো অনুষ্ঠানে নাচতে দেখলাম। ম্যামের মিষ্টিমধুর গান, অনলাইন প্রোগ্রাম পরিচালনা, অফলাইন অনুষ্ঠানের আয়োজন, ছাত্রীদেরকে সুন্দরভাবে রিহার্সাল করানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ প্রাপ্য।

শচীনাথ বাবুর প্র্যাকটিকাল ক্লাসে একটুআধটু বকাবকি, ছোট্টখাট্ট ভুল ধরিয়ে দেবার জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা রইল। বাসুদেব স্যারের ছাত্রীদের প্রতি সহযোগী মনোভাব সবসময় মনে রাখার।

দীপঙ্কর বাবু সাক্ষাৎ যেন গণিতের ‘প্রদীপ’। যাঁর আলোয় কত ছাত্রছাত্রী আলোকিত হচ্ছে প্রতিদিন। স্যারের মুচকি হাসির কথা বারেবারেই মনে পড়ে। হ্যাঁ গণিত বুঝতে হলে তো গোল্ডমেডেলিস্ট, সিলভার মেডেলিস্ট ডি.ডি স্যারের ক্লাস মিস করাই যাবে না।

শম্ভু স্যারের নম্র আচরণ, সুন্দর করে গণিতের প্রতিটি লাইন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার কথা না বলে পারছি না।

ইনা ম্যামের সরল-সহজ-সুন্দর কথাবার্তা, সপ্রতিভ চলন খুবই পছন্দ আমাদের।

দেবায়ন স্যারের অনুষ্ঠান পরিচালনায় মুগ্ধ আমরা।

লাইব্রেরিয়ান স্যারের যত্নে বইগুলো যেন আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে।

আমরা জানি ‘শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম’। শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীবৃন্দ কে আমার সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধা জানিয়ে এই লেখার ইতি টানছি।

হৃদয়ের ক্যানভাসে স্মৃতির পাতা

সাহিন বানু

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, প্রাক্তন ছাত্রী

স্কুল জীবনের শেষ দিন যতটা বেদনার, কলেজের প্রথম দিনটা ততটাই উৎসাহের ও উদ্দীপনার। দুঃখটা হল পুরনো বন্ধু, ক্লাসরুম, স্কুল অর্থাৎ একটা অভ্যস্ত জীবন ফেলে আসার আর আনন্দটা হল নতুন কলেজ, নতুন বন্ধু, নতুন ক্লাসরুম, নতুন স্যার-ম্যাম, নতুন পরিবেশ, নতুন জীবন, নতুন স্বপ্নগুলোকে অনেকটা কাছে পাওয়ার।

কৈশোর ফেলে যৌবনে পা রাখার সময়টাই যেন স্কুল ছেড়ে কলেজ যাওয়ার সময়। স্বপ্নের নদী ফেলে এসে যেন স্বপ্নের সমুদ্রে পা বাড়ানো। যেন এক অনন্য অনুভূতি। সমস্তটাই একটা নতুন স্বপ্নের বুনন। স্বপ্ন জীবনে সফল হওয়ার, কিছু করে দেখানোর, আবার কিছু ক্ষেত্রে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারার, মজা করার কিংবা জীবনে বিশেষ কারুর উপস্থিতি অনুভব করার। এই সমস্ত বিষয়গুলি উপলব্ধি করবার জন্যই যেন কলেজের দিনগুলি জীবনে আসে।

করোনার করাল গ্রাসে দু-বছরের বেশি কেটেছে সময়। সারা পৃথিবীতে যেমন সব তালাবন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তেমনি আমাদের ভাবনাবিশ্বে ঘটেছে তুমুল পরিবর্তন। আমরা অনেক সুখের মুহূর্তকে হারিয়েছি। সেই দিনগুলি আর ফিরে পাওয়ার নয়। তবে তারই মধ্যে যতটুকু পেয়েছি সেটাই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছি। এই কলেজ থেকে চিরতরে বিদায় নেওয়া কখনোই হয়তো সম্ভব হবে না। দীর্ঘদিন ধরে আমরা শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরার নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানে পড়েছি, এবং প্রত্যেক শিক্ষকের থেকে পেয়েছি আন্তরিক অভিভাবকত্ব। তাঁরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অজানা বিষয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করেছেন। বইয়ের পাতা থেকে মনের খাতায় উঠে এসেছে পাঠ্যবস্তু। বুঝিয়েছেন ইচ্ছে করলে আকাশ ছোঁয়া যায়।

স্মৃতির পাতায় অমলিন থেকে যাবে এই কলেজ... তার সবটুকু নিয়ে।

একটি ল্যাম্পপোস্টের আত্মকথা

মীনাক্ষী সামন্ত
ইংরেজি বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

একদিন হঠাৎ একটি কংক্রিটের রাস্তার ধারে আমায় কেউ বসিয়ে দিয়ে চলে যায়। তারপর পথ চলা শুরু। শুধু আমি না সঙ্গে আমার বন্ধুরা, তবে ওরা কিছুটা দূরে থাকে। আমরা একে অপরের সঙ্গে বলতে চাই অনেক কথা। কিন্তু মানুষ তো তাদের প্রয়োজনে আমাদের ব্যবহার করে। আমাদের বেঁধে দেয় একটা নির্দিষ্ট নিয়মে ও সময়ে। অন্ধকার, পৃথিবীকে যখন গ্রাস করে তখন মনে পড়ে আমাদের কথা। না হলে কি আর আমাদের সময় সন্ধ্যা ছয়টা থেকে পরদিন সকাল ছয়টা হত? তবুও তো এই নিয়ে আমাদের কোনো প্রতিবাদ নেই। ঠিক এই বারো ঘণ্টা, প্রতিটা দিন সাক্ষী থাকি অনেক ঘটনার। কখনও কোনো অসহায় ব্যক্তি আমার আশ্রয়ে আসে। আবার কখনও মদ খেয়ে গাড়ি চালানো ছেলেটিকে নিয়ে তার মা-বাবা, বন্ধুরা ঘোরে হাসপাতালের দরজায়। কখনও বা কুড়ি বছর বয়সী মেয়েটি রাস্তাটা পার হয় ভয়ে, কারণ আমার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে থাকা কতগুলো ছন্নছাড়া কুদৃষ্টিতে তাকায় ওর দিকে। রাত যখন গভীর হয় পাশের নির্জন জঙ্গল থেকে ভেসে আসে সেই অসহায় মেয়েটির কণ্ঠস্বর। আরো কত কী...

রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আরামপ্রিয় যন্ত্রের হর্ন থেকে কিছুটা নিস্তার পাই। কিন্তু তা আর কতক্ষণই বা। ভোরের আলো আকাশে হানা দিলেই মানুষ মনে করে আমাদের প্রয়োজন শেষ। সারাদিনের বারো ঘণ্টা তাদের আমাদের কথা আর মনেই পড়ে না। দিন – মাস - বছর কেটে যায়। বদলাতে থাকে চারপাশটা। কিন্তু এই অন্ধকারের সঙ্গী, সারারাতের সমস্ত ঘটনার সাক্ষীর কোনো পরিবর্তন হয় না।

একমাত্র

দেবায়ন চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বাবা আর মায়ের কোনোকিছুতেই মিল নেই। মা ছোটো মাছ খেতে পছন্দ করে। বাবা বড়ো মাছ ছাড়া খায় না। মায়ের চোদ্দ গুষ্টিতে নেশা নেই। বাবার আবার চিনি থেকে লিকার সবেতেই সমান আগ্রহ। একটা তরকারি আর ভাজা হলেই বাবা চেটেপুটে খেয়ে নিতে পারে। মা আবার অল্প করে হলেও পঞ্চব্যঞ্জনের পক্ষপাতী। যাইহোক, মশারি ছাড়া বাবা কিছুতেই ঘুমোবে না। পারলে ট্রেনেও মশারি নিয়ে যায়। মা বলে-- তোর বাবার শুধু মশার বাতিক, যেন সব মশা ওকেই ধরবে। মশাদের তো আর খেয়েদেয়ে কোনও কাজ নেই। মশারির ভেতর বহিরাগতদের আটকাতে বাবা হাজার হাততালি দেয়, মশা আর মরে না। এদিকে হুটহাট করে মা কীভাবে যেন আন্দাজেই মশাদের মেরে ফেলে।

খবর কাগজ সময়মতো না এলে বাবা পাগল পাগল বোধ করে। মা সেইসময় নিস্পৃহভাবে বলে—দিনের পর দিন পেপার না পড়েও দিব্যি থাকা যায়। বাবা একটা সিনেমা শুরু করলে শেষ না দেখে ছাড়ে না। মা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গ্যাপ দিয়ে সিরিয়াল দেখে। এবং স্টোরি লাইন নিখুঁতভাবে বলে দেয়। বাবা খাবার সময় একটা কথাও বলে না। মা খাবার পাতে গল্প করতে করতে হাত শুকিয়ে ফেলে। বাবা অন্ধকার ছাড়া ঘুমোতে পারে না। যত বেশি আলো, মায়ের ঘুম তত গভীর।

এভাবেই বাবা আর মা কাটিয়ে ফেলেছে পঁয়ত্রিশ বছরেরও বেশি। ইদানীং বাবা আর সন্ধেবেলা পাড়া ঘুরতে বেরোয় না। শরীরটা জুতের নেই। মায়েরও খেয়াল রাখতে হয়। যে যখন সুস্থ থাকে, অন্যজনের ওষুধ খাবার কথা মনে করিয়ে দেয়। ঘুমের মধ্যে বোবা ধরলে ধাক্কা দিয়ে বলে—এই যে... পাশ ফিরে শোও।

মা আর বাবার এত্ত অমিলের মধ্যেও একটা মনকেমন কিন্তু কমন...

কী সেটা?

দুজনেরই ছেলে কিন্তু বাইরে থাকে!

Creative Bytes

ছোটোগল্প

ওখানে যাওয়া মানা

কাবেরি গুড়িয়া

দর্শন বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

আমরা এই শেষ দুবছর নিজেদের করেছি কোয়ারেনটাইন। অচল সময়ে বদ্ধ পরিবেশে থাকতে থাকতে মন বারবার কোনো এক সমুদ্রের স্রোতে গা ভাসাতে চায়, বা হারিয়ে যেতে চায় কোনো এক অজানা জঙ্গলে।...যদি এমনই কোনো এক অজানা জঙ্গলে, পৃথিবীর আঁতুড় থেকে উঠে আসা কোনো অন্ধকার লুকিয়ে থাকে! যদি ঠিক এমন সময়েই সেইখানে ঘটে যায় এমন কিছু ঘটনা যা সবার বিশ্বাস কে নাড়িয়ে দিতে পারে।.

চলুন আজ আপনাদের নিয়ে যাই সেই অজানা এক দ্বীপে...যেখানে বছরের পর বছর ধরে চাপা পড়ে আছে বহু অন্ধকারের ইতিহাস।

(২)

কৃষ্টি আর আরশি ছোটবেলার বন্ধু। লোকে বলে টম আর জেরি ওরা। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লেগে থাকলেও যেকোনো কাজ তারা একসঙ্গেই করে। তবে তা কর্ম না বলে অপকর্ম বলাই ভালো। ছোট্ট বনছায় ঘেরা গ্রামটা যেন বৈদিক যুগের আদিকাল থেকেই হঠাৎ করে কোনো এক টাইম মেশিনে করে এখানে এসে পড়েছে। সেই সময়ের মাটি আর কাঠের তৈরি বাড়ির মাথায় বনলতা আর ফুলগুলো অবাধ আনন্দে আঙিনা অধিকার করেছে। কৃষ্টির বাড়ির পেছন দিকে আছে একটা জ্যান্তদ্বীপ। কৃষ্টি অবশ্য জানে ওটাকে বলে প্রবালদ্বীপ, সে বইতে পড়েছে।

ওদের গ্রামটার নাম সাতক্ষীরা। আর আরশিদের পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন সাতক্ষীরার রাজা। অনেক বছর আগে এই জঙ্গলে কিছু লোকজন নিয়ে চলে আসেন আর এখানে রাজত্ব শুরু করেন। তখন ছিল এটা গহিন জঙ্গল। এখন অবশ্য সময়ের সঙ্গে আর বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন তারা নয়।

তবুও তাদের সাতক্ষীরা গ্রামটাকে বাইরের জগতের মানুষেরা কেমন যেন এড়িয়ে চলে। আর ওদের মন্দিরের দেবদেবী যারা নামে এক হলেও যেবার ওদের গ্রামে মিলি, তিথি বেড়াতে এসে ওদের দেবমূর্তি দেখে ভয় পেল, তখন বুঝেছিল সে কোনো এক কারণে তাদের গ্রামে সবই আলাদা। এটা অবশ্য আরশি আগেও ভেবেছে, তাদের গ্রামের মহাকালের মূর্তি প্রশান্ত নয় বরং বেশ ভয়ঙ্কর যা দেখলে ভক্তির আগে ভয় আসে ...কাউকে জিজ্ঞেস করলেই বলে— 'শাপ। শাপ। ভীষণ সে অভিশাপ'। কিন্তু কী সেই অভিশাপ তা আর কেউ বলে না ।

কৃষ্টি লক্ষ করেছে তাদের গ্রামের পশ্চিম দিকে যে জঙ্গলটা আছে সেটাতে যাওয়া তো দূর সেই জঙ্গল এর কথা বলাও মানা তাদের, সে জানে না কেন সেই জঙ্গলের কথা বললে সবাই ভয়ে কেঁপে ওঠে।

একদিন কৃষ্টি আর আরশি ঠিক করল তারা পাঁচদিন পর যে পূর্ণিমা আছে ওইদিন ওই জঙ্গলে

যাবে আর রহস্য খুঁজে বের করে পুরো গ্রামকে তাক লাগিয়ে দেবে।

(৩)

পাঁচদিনের অসহ্য অপেক্ষার শেষে এল সেই দিন। দুই বন্ধু একসঙ্গে কাটাবে বলে আরশি চলে এল কৃষ্টির বাড়িতে, তারপর সবাইকে লুকিয়ে রান্নাঘরের ছুরি, মোবাইল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তারা সেই অজানা ইতিহাসের পেছনে যা রহস্যের বেড়াজালে লুকিয়ে আছে ওই পশ্চিমের জঙ্গলটায়।

পূর্ণিমা রাতের চাঁদ যেন মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। চারদিকটা বড়ো মহোময়। সব কিছু যেন হঠাৎ বড়ো কিছু ঘটবার অপেক্ষায় ওঁত পেতে বসে আছে। হঠাৎ আরশি লক্ষ করল চারদিকটা যেন বড়ো বেশি নিঃশব্দ...কোনো ঝিঁঝিঁর আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

গ্রামের মেয়ে আরশি.,.শহুরে মেয়েদের মতো আরশোলা দেখে ভয়ে চিৎকার করে না সে। কিন্তু আজ কেন জানি না তার গা-টা ছমছম করতে লাগল। সে বলল, আমার কেমন একটা লাগছে রে, দেখ চারদিকে একটা জোনাকি পর্যন্ত নেই। সবাই যেন কোনো একটা অজানা আশঙ্কাতে লুকিয়ে পড়েছে ।

তার এই কথা শুনে কটমট করে তাকাল কৃষ্টি-- তোর পূর্বপুরুষ নাকি খুব বীর ছিলেন। তোর এই সাহসের নমুনা। এতই যখন ভয়, যা গিয়ে ঘুমো। আমি একাই যাব। ভিতুর ডিম একটা।

ওর মুখে এমন কথা শুনে আরশি চুপ করে গেল। শুধু অজানা একটা ভয়ে নীরবে পথ চলতে লাগল সে। আরশির হঠাৎ মনে পড়ে গেল একদিন লুকিয়ে সে তার বাবার মুখে শুনেছিল সেখানে নাকি তাদের পূর্বপুরুষদের পাপ লুকিয়ে আছে। এইসব ভাবতে ভাবতে তারা চলে এল সেই বাড়িটাতে। দেখতে অনেকটা টিলার মতো, আর এরমধ্যেই যেন কোনো এক ভয়ানক ইতিহাস লুকিয়ে আছে। একটা মস্ত খিলানবাড়ি ধ্বংস হয়ে এসেছে প্রায়, তবুও তার প্রতিটি রোমকূপ শিল্পকলার অনন্য স্বাক্ষর বহন করছে। খিলানের গায়ে গজিয়ে উঠেছে বট-অশ্বত্থ চারা। মাকড়সার জাল এড়িয়ে পথ চলা দায়, যেতে যেতে তারা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল, এমন সময় হঠাৎ তাদের পেছন দিকে বিকট শব্দ করে পেল্লাই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

তখনই কৃষ্টি আর আরশির নজর গেল একটা ঘরের দিকে তার চারদিকে যেন কী সব গণ্ডি কাটা, ঘরটা দেখে ঠাকুরঘরই মনে হল কৃষ্টির অনেক চেষ্টা করেও দরজাটা খুলতে পারল না সে। তাই চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে খুঁজতে লাগল। হঠাৎ দেওয়ালের ফাঁকে খুঁজে পেল একটা পুথি। এদিকে আরশি নিজের খেয়ালে একটা দরজা ছুঁয়ে দিতে ক্যাঁচ আওয়াজ করে দরজাটা খুলে যেতেই দুজন চমকে উঠল। তারপর দুজন সেই ঘরটাতে ঢুকল। অন্ধকার ঘরটায় যেন নিকষ আঁধার রহস্য বুনছে। হঠাৎ দুজনের ফ্ল্যাশলাইটটা নিভে যেতেই ভয়ে চিৎকার করে উঠল আরশি। কৃষ্টি মনে মনে ভয় পেলেও আরশিকে বুঝতে দিল না। এদিক-ওদিক হাতড়ে একটা প্রদীপ পেল ওরা। তেলও ছিল কিছুটা তাতে। পাথর ঠুকে ঠুকে প্রদীপ জ্বালাল তারা। পুঁথিটা

কি একটা ভাষায় লেখা। আরশি চিনতে পারল ওটা চর্যাপদ। আরশি পড়তে শুরু করল—" যে মহাপাপ পূর্ণিমা রাতে হয়েছিল, তার অভিশাপই ঘিরে ধরেছে প্রাসাদটা। মহারাজ সম্পদের লোভে মহাকালীর ভয়ংকর রূপ উগ্রমস্তাকে জাগিয়ে তুলেছেন, একশোজন মানুষের তাজা রক্তের দ্বারা যারা আজ পিশাচ ও রক্তলোলুপ হয়ে গেছে। বৌদ্ধ মহাকাল দ্বারা তাদের বন্দী বানানো হয়েছে। কিন্তু কোনোদিন যদি পূর্ণিমা রাতে রাজা বা তাদের কোনো বংশধর এই দরজা খোলে এবং এই প্রদীপ জ্বালে, তবে উগ্রমস্তার পিশাচ জেগে উঠবে, আর ভয়ানক প্রতিশোধ নেবে। কেউ বাঁচবে না, কেউ না।" পড়তে পড়তে ঘেমে উঠেছিল ওরা। হঠাৎ ঘরের প্রদীপটা নিভে গেল।

(৪)

দিন দুই পরে এক অনামী সংবাদ পত্রিকায় বের হয়েছিল একটা খবর—" হঠাৎ করেই সাতক্ষীরা গ্রাম থেকে সব মানুষ এক রাতের মধ্যে উধাও হয়ে গেছে। হঠাৎ করেই সব গ্রামবাসী কোথায় চলে গেছে তা জানা যায়নি। গোপন সূত্রে জানা গেছে যারা ওই গ্রামে পরবর্তীকালে গেছেন কেউই ফিরে আসেননি। ঘটনার সত্যতা স্থানীয় পুলিশ তদন্ত করছেন। "

নতুন দিশা

দীপান্বিতা সামন্ত
রসায়ন বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

কি বাপু, এ পাড়ায় নতুন নাকি ? আপনি তো দেখছি মেয়েদের মতো লজ্জা পাচ্ছেন। শিবু চোখ ঘুরিয়ে ঘরটাকে দেখছে। পাঁচ বাই সাতের ছোট্ট একটা কামরায় একটা চৌকি পাশে রেখে একটা টেবিল রাখা আছে। সেটাকে বড়ো টুল বললেও ভুল হবে না। চৌকিতে বসে শিবুর পশ্চাৎ দেশ তোশকের উপস্থিতির কারণে বিদ্রোহ ঘোষণা করছিল। টেবিলে একটা ময়লা ভরা জগ, তাতে জল তলানিতে। দেওয়ালে একটা ছোট্ট তাক,তাতে একটা মরচে পড়া ভাঙা ট্রাঙ্ক দাঁত বের করে আছে। ঝোঁকের বশে এসে কি ভুল হল? এসেই যখন পড়েছে আর ঠিক ভুল বিচার করে কি হবে।

শিবু ঘরের এদিক ওদিক দেখতে লাগল।

কি এদিক ওদিক দেখছেন বাপু? আজ অব্দি কেউ এই রেখার কাছে এসে অন্য দিকে দেখার সাহস করেনি। আমার রূপের ঝলক দেখে এপাড়ার মেয়েরা ঈর্ষা করে। আর আপনি কি না...লাইন শেষ করার আগেই শিবুর অতর্কিত প্রশ্নে বেশ্যাপাড়ার সুন্দরী রেখা থেমে গেল। শিবু অন্য দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল--কতদূর লেখাপড়া করেছ?

মেয়েটি বলল, আপনি কি আমাকে চাকরি দিতে এসেছেন? যে আমার লেখা পড়ার খোঁজ করছেন? যে কাজ করতে এসেছেন তাড়াতাড়ি করুন। আর চলে যান। একজনকে এত সময় দিলে আমার চলবে না। সময়ের অনেক দাম এখন। শিবু বলল, কত টাকা ?

মানে কি বলতে চাইছেন আপনি? শিবু বলল, আজকে রাতের জন্য কত টাকা?

--দশ হাজার টাকা,পারবেন দিতে ?

শিবু ব্যাগ থেকে টাকা বের করে তার কাছে দিয়ে বলল, পনেরো আছে। তবে একটাই শর্ত যা জানতে চাইব তার সঠিক উত্তর দেবে আর বেশি কিছু চাই না। শিবুর কথার মধ্যে কিছু একটা ছিল। রেখা তার নিজের জায়গাতেই বসে পড়ল। বাইরে গাড়ি ও মাইকের আওয়াজে বাড়ির নীরবতা যেন সব ফিকে হয়ে গেল।

নীরবতা ভেঙে শিবুই বলে উঠল-- একটা প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু উত্তর পাইনি এখনও। রেখা বলল--বাবু মাধ্যমিক দিয়েছিলাম কিন্তু রেজাল্ট জানার ভাগ্য হয়নি। বাড়িতে কতজন আছে?

রেখা একটু হেসে বলল-- কেউ থাকলে কি আর এখানে থাকি, আমার তিন কুলে কেউই নেই। শিবু বলে-- তো এখানে কী করে এলে?

কেউ কি আর নিজের ইচ্ছায় আসে, পরিস্থিতির চাপে মানুষকে আসতে হয় এখানে। কেউ দারিদ্র্যের কারণে বিক্রি হয়ে যায় তো কেউ নিজের বোঝা নামাতে এখানে চলে আসে। কিন্তু একবার এই এখানে এলে এখান থেকে বেরোনোর পথ বন্ধ।

শিবু বলল--তোমার কারণটা বলো যদি কোনো আপত্তি না থাকে তো...

আপত্তি কীসের বাপু?-- হাজার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও নিজেকে কত পুরুষের সামনে মেলে ধরি। টাকা পুরোপুরি ভাবে উশুল করার জন্য আমার শরীরটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, কামড়ে ধরে। এই প্রথম কোনো পুরুষ আমার শরীর না ছিঁড়ে, আমার ভিতরের আমিকে জানতে চেয়েছে।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে রেখা বলতে শুরু করল-- জানেন বাপু আমার নাম রেখা ছিলই না। বাবা মা ভালোবেসে কত সুন্দর একটা নাম দিয়েছিল লিপি। কতকাল হয়ে গেল ওই নামে কেউ ডাকেনি আমাকে। বীরভূমের পলাশপুর গ্রামে বাড়ি আমার। কত বড়োবাড়ি ছিল আমাদের। বাবা-মা-কাকা-ঠাকুমা সবাই মিলে একসঙ্গে থাকতাম। সবার কাছে কত আদরের ছিলাম আমি।

সবে হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছি। বানের জলে পুরো গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। তারপর গ্রামে আসে কলেরা নামক মহামারী। এই মহামারী কেড়ে নেয় আমাদের পরিবারের তিন জনকে বাবা মা আর দাদু। কাকু বিয়ে করে বউ আনলে কাকিমা তখন সংসারের হাল ধরেন। মায়ের অভাব বুঝতে দেয়নি কাকিমা। খুব ভালোবাসতেন আমাদের। তারপর দুটো ভাইবোন পেলাম। কিন্তু হঠাৎ করেই অসুখের কারণে ঠাকুমাও আমাদের ছেড়ে চলে যান। ঠাকুমা চলে যেতেই কাকিমা কেমন যেন বদলে গেলেন। তখন আমি ক্লাস টেন। কাকিমা অকারণেই বকাবকি করতেন। স্কুল যাওয়া নিয়ে রোজ বকাবকি করতেন। কাকু বুঝিয়ে বলল, দাদার অনেক ইচ্ছা ছিল লিপি যেন মাধ্যমিক দেয়। তাই কাকিমা আর কিছু বলেনি। আমাদের পরীক্ষা শেষ হতেই ঠিক হয় আমরা সবাই কাকিমার বাপের বাড়ি যাব। সেদিন বিকেলে ট্রেনে আমরা চারজন বেরিয়ে পড়লাম কাকিমার বাপের বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশে। দাদুর গ্রামের বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। স্টেশনের বাইরে একটা চা দোকানে চা খেয়ে কিছুদূর যেতেই চারিদিক যেন ঝাপসা হতে হতে অন্ধকার হয়ে গেল, তারপর আর কিছু মনে নেই আমার। ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার হাত পা মুখ সব বাঁধা। কিছুক্ষণ পর ট্রেনের শব্দ পেলাম। বুঝলাম স্টেশনের কাছেই আছি। তারপর দেখি কাকিমা দুজন গুণ্ডার মতো লোকের সাথে হাসতে হাসতে আমার দিকে আসছে। আমি ওদের দেখে চিৎকার করলাম। কিন্তু আমার কষ্ট ওরা তোয়াক্কাই করল না।

কাকিমা আমার কাছে এসে বলল-- কী ভাবছিস? কেন করলাম এসব? আর কতদিন তোকে এভাবে বসে বসে খাওয়াব? তারপর তোর বিয়ের কত খরচ। তোকে অনেক আগেই বিদায় করতাম। কিন্তু ওই বুড়ি তার জন্য তোকে তাড়াতে পারিনি। আজ সেই সুযোগ হল। জানিস এরা আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছে। তুই চিন্তা করিস না। এরা তোকে মারবে না তোকে ভালো জায়গাতেই নিয়ে যাবে। তোর কাকুর চিন্তা করিস না। ওকে আমি বুঝিয়ে বলে দেব।

কাকিমার মুখ থেকেএরকম চরম সত্যি কথা শুনে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সেই যে ঘুমোলাম উঠে দেখি এই ঘর। জানেন বাপু দশ বছর ধরে এই বাড়িতেই আছি। বলতে বলতে রেখা কান্নায় ভেঙে পড়ল। শিবুর চোখ ঝাপসা হয়ে এল। জলে ভর গেল কথাগুলো শুনে। দুজনে কতক্ষণ

নীরবে বসে ছিল জানা নেই। শিবু কী বলে ডাকবে খুঁজে না পেয়ে হঠাৎ করেই বলে উঠল-- লিপি।

লিপি ধীরে ধীরে মাথা তুলল, হ্যাঁ দীর্ঘ দশ বছর পর লিপি নামটা শিবুর মুখ থেকে শুনতে পেয়ে সে শিবুর পায়ের কাছে গিয়ে বসল। তিরিশ বছরের শিবু এখন অন্য মানুষ, দেখে বোঝার উপায় নেই এই সেই শিবু যে সন্ধ্যাবেলা বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। এমবিএ করা ছেলে বাড়ির ব্যবসায় নজর না দিয়ে নোংরা বস্তিতে ঘুরে বেড়ায় এটাই শিবুর অপরাধ।

--এখান থেকে বেরোতে ইচ্ছা করে না?

--করে বাপু অনেক করে। কে এই নরকে থাকতে চাই বলুন?

--তাহলে বেরিয়ে আসেননি কেন ?

--কোথায় যাব বাপু? সমাজ এই বেশ্যাকে বেশ্যালয়ের বাইরে ঘৃণার চোখে দেখে। বেশ্যা বা বেশ্যার সন্তানকে কোনো স্কুল বা কলেজ বা অফিস কোথাও কাজ দেয় না। এরাই আবার অন্ধকারে আমাদের ঘরে ঢোকে। একবার এখানে এলে বেরোনোর পথ আর নেই।

--বইগুলি তোমার ?

--হ্যাঁ! বাপু। কামাই আর তার কিছু কালী মাসীকে দিই খাওয়া-দাওয়া আর বাড়িভাড়া বাবদ। বাকিটা নিজের। সেই টাকা থেকেই কিছু বই কিনে রাখি। সময় হলে পড়ি বইগুলো।

--আমার সাথে যাবে লিপি? না না আমার বাড়িতে নয়। তুমি যে সমাজের কথা বলছ সেখানে আমার পরিবারও থাকে।আমি একটা সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। আমরা পথশিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিই ,সমাজ যেসব মেয়েদের ফেরায় না আমরা তাদের স্বনির্ভর করি। আরো নানা কাজ রয়েছে। তুমি চাইলে আমার সঙ্গে আসতে পার। আমি তোমার একটা ব্যাবস্থা করে দেব সেখানে। সেখানে হয়তো বেশি টাকা পাবে না কিন্তু পাবে অনেক সম্মান, নিজের পরিচয় পাবে। সেখানে সবাই তোমাকে গ্রহণ করবে।

--আমার টাকা লাগবে না বাপু। অনেক টাকা ব্যাংকে আছে আমার। চাই শুধু এই নাম থেকে মুক্তি।

ভোর হয়ে এসেছে। সূর্যোদয়ের লাল আলোর আভা ছড়িয়ে পড়েছে। রাস্তার আলো এক এক করে নিভে যাচ্ছে। দুজন মানুষ ধীর গতিতে এগিয়ে চলছে। ছেলেটির রেখাঙ্কিত পথে মেয়েটি কতগুলি বইকে বুকে আগলে রেখে হেঁটে চলছে একটি নতুন দিশার খোঁজে। অন্ধকার কলুষিত জায়গা থেকে মুক্তি হল আজ লিপির।

শিবু লিপিকে থাকার জন্য একটা বাড়ির ব্যবস্থা করে দেয়। লিপিকে নিজের অফিসে কাজ দেয় শিবু। বেতন কম হলেও লিপি তার কাজ খুবই মন দিয়ে করত। লিপি এখন সম্মানের সঙ্গে সমাজে আর পাঁচ জনের মতো দিন কাটাই। যে অন্ধকার দশ বছর আগে লিপির কাকিমা তাকে দিয়েছিল, সেই অন্ধকার শিবু এসে লিপির জীবন থেকে দূর করে দেয়। এক নতুন জীবন দিল শিবু তাকে। তার জন্য সে শিবুর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। এভাবেই এক নতুন দিশা খুঁজে পেলো লিপি। আর সেই রেখা নামটা থেকে তার মুক্তি হল চিরকালের জন্য।

COCONUT

Aytihya Das

Masters in English

Vidyasagar University

Day 1

Smriti (her name should be Bismriti. She did not retain a single thing more than 2 seconds) got a coconut from Duti's mother. Duti was the most educated girl in the village and Smriti's neighbour. Duti's mother told Smriti ten times to take the coconut and go straight to her mother. But Smriti was Smriti (Bismriti). It was against her tradition to remember anything for more than ten seconds.

One call of the ice-cream seller and she instantly erased Duti's mother's every word, every warning. She put the coconut on the floor of *tulsimanch* nearby and rushed to the ice-cream seller. Neither did she come for the coconut nor did she ever recall about the coconut.

Day 4

"Duti's ma is this coconut yours? It has been here for two days," asked Choto thakuma (the CCTV camera and troublemaker of the village). "No *thakuma* it is not mine. Even I am going to ask about it. Who left it here? " Duti's mother seemed puzzled. "This coconut is not yours, nor even ours. Who left it here? And why?" "No idea thakuma." Thakuma continued,"Bouma your Duti is the brightest student in the village. Even some people called her choto scientist." Hearing this Duti's mother became very happy. "What to say thakuma. *Sobi bhogobaner kripa*." "No bouma. You have not the least idea about villagers' jealousy. I think someone whose child is not intelligent or not good in studies might have put this coconut here. You will take this coconut in your house by thinking that it is yours. And as soon as Duti will touch it.....no I think when she will come near it, all her intelligence, god gifted memory power, capacity to solve difficult maths.... allllll..... all....will instantly be transferred to the dumb one. It's a kind of *kala jadu*. Oh god! save the little girl from this horrible plotting."

These words startled Duti's mother. She said impatiently," You are right *thakuma*. Many people get jealous of my daughter. What a horrible plotting. Thakuma what to do now? "

"Hmmmm.. Let this coconut remain here. The culprit, *soitan* will surely come every day to check if you have taken the coconut. Then we will catch her red handed. And *vogobaner dibbi* she will get such a harsh punishment that she will remember it till death. Just keep looking out for the culprit. "

Day 5

Morning 7 a. m. was basically midnight for Smriti. But today a clamour outside her house woke her up. Coming out of the house, she saw a large crowd in front of Duti's house. When she went there she found that Sarala aunty was the matter of concern in the crowd. (She may be the poorest person in the village). She was crying and desperately tried to say something to which the crowd didn't pay heed. Choto thakuma and Duti's mother kept yelling at her and cursing her. A sullen Duti was standing beside her mother. When Smriti asked her about the matter her answer left Smriti at her wits' end. " Sarala aunty left a *jadoui* coconut on the *tulsimanch* so that when mother takes it home, its magical power immediately transfers my intelligence to Sarala auntie's spoilt, dumb boy who is always a headache to his patents. My mother and thakuma kept a keen eye on the coconut and today Sarala aunty came near it. Thakuma caught her red handed. When she was asked about it, she started to give excuses that she came here only to pluck flower as usual. Hmm...as if we don't know about her son and are unable to understand her intentions."

Looking blankly at her for few seconds, Smriti could only manage to say," Are you off your head? Do you really believe in all these nonsense? "Duti looked sulkily back at Smriti. When Smriti went nearer to the crowd she suddenly notice the coconut laying on the *tulsimanch*. She was taken aback and immediately recalled what she had done. Taking the coconut she rushed into the crowd. Thakuma had already slapped Sarala aunty and was prepared to continue thrashing Sarala. Smriti stopped her and told her the whole story of the coconut which actually Duti's mother had offered to her a couple of days back. "You are lying na. You make this story to save this *churail*." "No Thakuma. Believe me. Ask Duti's mother. Aunty, tell Thakuma. Look at this black spot in the coconut. You show me this and told me to give it to my mother and eat it as soon as possible. But my bad luck, I forgot everything and left it here. Look at it aunty."

Duti's mother identified the coconut and started smiling." Haha..Smriti. Such a funny creature you are. I think God forgot to give you brain." Saying this, she entered into her house and Duti followed her. The crowd also started to become thinner. After few seconds only Smriti, Thakuma and Sarala aunty were left. "Why are you crying now Sarala. You are now winner. Stop crying. Attention seeker." Saying this, trouble maker Thakuma left the place angrily. Sarala aunty was still crying. Yes she got punishment (for no reason) and the humiliation she would remember forever. Smriti stared at Sarala aunty who was the victim of her forgetfulness. Sarala aunty's humiliation and tears were all caused by her. This realisation weighed heavy on her mind. She could not bear her to see the weeping woman anymore and left the place in a hurry.

The coconut which she now hated with a blind passion was still in her hand. On her way to her home, she stopped near a pond. She flung the coconut out into the pond with all force she could muster. Making a sound, the coconut sank in the dark bottom of it.

Glossary:

Tulsimanch-small podium-like stone or cement altar

Kala jadu- black magic

Thakuma- Grand mother

Bouma- Daughter-in-law

Churail- Witch (derogatory)

Jadoui- occult, magical.

আলোর স্বপ্ন

সুপর্ণা সামন্ত

ইংরেজি বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

স্বপ্ন! স্বপ্ন! স্বপ্ন! স্বপ্ন দেখতে কে না ভালোবাসে! সবাই ভালোবাসে স্বপ্ন দেখতে। কেউ স্বপ্ন দেখে ডাক্তার হবে, কেউ বা আবার মাস্টার, কেউ স্বপ্ন দেখে তার স্বপ্নের জায়গায় ঘুরতে যাবে, আবার কেউ স্বপ্ন দেখে যেভাবেই হোক পরিবারকে ভালো রাখার। কেউ স্বপ্ন দেখে সেই দিনটার , যেদিন সে তার প্রথম উপার্জনটা বয়স্ক বাবা-মার হাতে তুলে দেবে আর বলবে—'শোনো বাবা কাল থেকে আর তোমায় কাজে যেতে হবে না।' বৃদ্ধাশ্রমে থাকা বয়স্ক মা-বাবাও স্বপ্ন দেখে তার খোকা এসে তাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তি একটা সুন্দর শারীরিক-মানসিক যন্ত্রণাহীন দিনের স্বপ্ন দেখে। আরো কত স্বপ্ন!

কিন্তু, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মানো মেয়ের কি আদৌ কোনো স্বপ্ন দেখার অধিকার আছে? জানি না। আলোও জানত না। তবুও সেই সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মানো মেয়েটিও স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্ন দেখেছিল একজন শিক্ষিকা হওয়ার, একজন সমাজ সেবিকা হওয়ার, স্বপ্ন দেখেছিল সবার কাছে নিজেকে প্রমাণ করার। ছোটোবেলা থেকেই পড়াশোনায় বেশ ভালো ছিল আলো। প্রত্যেক ক্লাসে হয় প্রথম, না হয় দ্বিতীয়। বাবা ছিলেন দিনমজুর,তাই যতটা সম্ভব অভাবের সংসারে আলোকে তার পড়াশুনার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি কিনে দিতেন। তবে বেশিরভাগ সময়েই আলোকে তার দরকারী বইপত্র ও জিনিসগুলোর জন্য আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের ওপর নির্ভর করতে হত। তবে পড়াশোনার ব্যাপারে ওকে স্যার বা ম্যাডাম সাহায্য করতেন বইকি, তবে সবসময় তা যথেষ্ট নয়। যাইহোক দশম শ্রেণীতে ওঠার পর সে পড়াশোনায় আরো মন দেয় এবং জোর কদমে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়। এরপর যথারীতি পরীক্ষা হয়, ফলাফল আশানুরূপ। স্কুলে আবার প্রথম স্থান অধিকারের সঙ্গে জেলার মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

ছোটোবেলা থেকে দেখা স্বপ্নের দিকে এক কদম এগিয়ে গেল আলো। একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হল। সবাই বলেছিল 'খরচা আছে পড়াশুনোয়, তোর বাবা দিতে পারবে তো?' কথাটা শুনে আলো শুধু হেসেছিল। কারণ এই কথা ওর মনে কোন ছাপ ফেলেনি, কারণ, ও জানত অনেক বাধা আসবে কিন্তু ওকে স্বপ্ন পূরণ করতেই হবে। অর্থের অভাবের জন্য বিজ্ঞানের দামি দামি বই কেনার সামর্থ্য আলোর ছিল না, কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদ ওর সঙ্গেই ছিল। তাই বইয়ের প্রতি ভালোবাসা, পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ, স্যারেদের প্রতি আনুগত্য, কৃতজ্ঞতার জন্য তাঁরাও খুব স্নেহ করতেন আলোকে। তাই বইপত্র, নোটস এবং এক্সট্রা ক্লাস করে সাহায্য করতেন ছাত্রীটিকে। সবকিছু আলোর স্বপ্ন অনুযায়ী চলছিল। এই সময়ই একটা 'অভিশাপ'

এল। আলো দেখতে বেশ সুন্দরী ছিল, স্বভাবও ছিল বেশ মিষ্টি, ভদ্র। এক ব্যবসায়ী পরিবার থেকে সম্বন্ধ এল। পরেরদিন বাবা-মা সমেত ছেলে দেখতে আসল আলোকে, পছন্দও করল। সব কি তাহলে শেষ! আলোর স্বপ্ন! না শেষ হয়নি সব। পরপর দুদিন আলো স্কুলে যায়নি। টিউশনেও যায়নি। তাই জীবনবিজ্ঞানের মাস্টারমশাই আলোর বাড়িতে এসেছেন খোঁজ নিতে। এসে সব কথা শুনে মাস্টার মশাই বাড়ির সবাইকে বোঝান, সবাই বোঝেও। আপাতত সবাই এই বিষয়টা নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না বলে। আরো একটা বাধা পেরোয় আলো।

এরপর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে কলেজে পদার্থবিদ্যা নিয়ে ভর্তি হয়। প্রথম চারটি সেমেস্টারে প্রথম হলেও শেষ দুটো সেমে পিছিয়ে পড়ে সে। বাবার শারীরিক অসুস্থতাই এর কারণ। সাময়িকভাবে হতাশ হলেও নতুন উদ্যমে আবার পড়তে শুরু করে। সাথে কিছু বাচ্চাদের পড়াতেও। ক্রমে ক্রমে স্নাতকোত্তর পড়াও শেষ হয়। বাবার শরীর খারাপ হলেও সেই অসুস্থতার প্রভাব নিজের পড়ার ওপর পড়তে দেয়নি মেয়েটি। স্বপ্নের মতোই যেন আলোর

জীবন চলছিল। স্বপ্নের সিড়ি বেয়ে সে প্রস্তুতি নিতে লাগল এসএসসি-র। পরীক্ষা দিয়ে আসার পর মা জিজ্ঞেস করেছিল—'কেমন হল রে?' 'ভালো হয়েছে মা।' আলো ডাক পেল ইন্টারভিউ-এ। খুব একটা খারাপ হল না। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকা বেরোলে দেখা গেল সেখানে আলোর নাম নেই। স্কুলের স্যার দেখা করে বলে গেলেন—'প্যানেলে তোর নাম নেই এটা অবিশ্বাস্য!'

ছোটোবেলা থেকে ছবির মতো ভাসতে থাকে সংগ্রামের জীবন। নিজের মতো করে আলো একটা স্বপ্নের পেছনে ছুটছিল। ভেঙে গেল বুঝি এইবার। একটু নিভৃতি খোঁজে সে। আবার নতুনভাবে সে শুরু করবে। করবেই।

সমাজ কি আর মূল্য দেবে এই পরিশ্রমী পথ চলার? সবাই শুধু পরীক্ষার নম্বর দেখে, তার ভিত্তিকেই যাচাই করে মানুষকে। কিন্তু অদেখা ইতিহাস যে আড়ালেই থেকে যায়। সবাই তো শেষ পরিণতিটাই দেখে, কেউ তো আর এই জীবনের লড়াইটা দেখে না!

মধ্যবিত্ত ছেলে

শ্রেয়া আদক
ইংরেজী বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

ছেলেটির বয়স পনেরো, সবে মাধ্যমিক দিয়েছে। অভাবের সংসারে বাবা চায় ছেলে এবার তার কাঁধে কাঁধ মেলাক। কিন্তু ছেলের মন চায় পাশের বাড়ির দাদাটার মতো সেও একদিন ফটোগ্রাফার হবে। এর জন্য ক্যামেরাটাও তার চাই। মনের কথাটা কয়েকটা দিন পরে মায়ের কাছে প্রকাশ করে। মায়ের মন কোনোমতে বাবাকে রাজি করায়। এবার ছেলের বয়স আঠারো পূর্ণ হল। আর চলে না, বাবার কথাই এবার মেনে নিতে হবে। কোনোক্রমে নিজেকে বুঝিয়ে বেরিয়ে পড়ে কাজের সন্ধানে। প্রথম কিছুদিন কষ্টে কাটে দিনগুলি, হানা দেয় ফেলে আসা স্বপ্ন। কিন্তু ওই যে বাড়ি, মা, বাবা, বোন, আর শখের ক্যামেরাটা...

মাসের শেষে বেতন পেয়ে বাড়ি ফিরে আসা ছেলেটি মায়ের চিকিৎসা, বাবার নতুন জুতো ও বোনের শখের নেইলপলিশ নিয়ে আসে। দেখল কিছুটা টাকা এখন রয়েছে। ভাবে এই দিয়ে সে তার শখের জিনিসটা কিনতে পারবে। কিন্তু হঠাৎ সামনে আসা বোন মনে করায়, তার স্বপ্ন ও বিয়ের জন্য কিছুটা খরচ রয়েছে। তাই বাড়তি টাকাটা খরচ না করাই ভালো। সমস্ত মাইনের টাকার হিসেব শেষ। নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেয়—'এইবার নয়,পরের বার শখ পূরণ করিস।' অন্তরের আত্মা আরো একবার মনে করায়--'তোরা মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে। তাই তোদের স্বপ্ন হয়তো এভাবেই অধরা থেকে যাবে।' ছেলেটি বাধ্য হয় সেই কাজের জগতে আবারও ফিরে যেতে।

নতুন জীবন

টগরী বিন্দাই
ইংরেজি বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

পাড়ায় হইহই কাণ্ড। স্বর্গীয় মিত্রদার গিন্নি, চল্লিশোর্ধ্ব অনুপ্রিয়া দেবী নাকি কলেজে ভর্তি হবেন। এরইমধ্যে প্রতিবেশীদের মধ্যে শুরু হয়েছে সমালোচনা, রঙ্গব্যঙ্গ। ওঁর শাশুড়ি নির্মলা বাইরের অবস্থা দেখে অনেকবার বউমাকে বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু মেয়ে কল্যাণী শক্ত করে ধরল মায়ের হাত। স্বামীর মৃত্যুর পর অনুপ্রিয়া দেবী নিজে একা মেয়েকে সামলে, টিফিন সার্ভিস করে সংসার চালিয়েছেন। আজ মেয়ে প্রতিষ্ঠিত। তবু এতগুলো বছর পর!

আবার পড়াশুনো শুরু করে নিজেকে নতুনভাবে পরিচিত করার জেদ, পছন্দের বিষয় নিয়ে আরো একবার পড়বার অদম্য ইচ্ছা ঘিরে ধরল অনুপ্রিয়াকে। ভাগ্যের পরিহাসে উচ্চমাধ্যমিক পাসের পর হঠাৎ বিয়ে হয়ে যাওয়া, তারপর সংসার-সন্তান, এর মাঝে একজন গৃহিনীর আবার ছাত্রী হওয়ার যাত্রাটা যে খুব একটা সহজ হবে না তিনি তা জানতেন।

নির্মলা দেবী বলতে শুরু করলেন—ভেবে দেখো একবার অনুপ্রিয়া। এই বয়সে কলেজে গেলে লোকজন কী বলবে ভেবে দেখেছ একবার? শান্ত ভাবে অনুপ্রিয়া উত্তর দিলেন—লোকজনের আর কি? কিছু একটা পেলেই সমালোচনা করতে শুরু করবে। লোকের কথা শুনে নিজের ইচ্ছেগুলোকে আগে বিসর্জন দিয়েছি। কিন্তু আর নয়। পড়তে আমাকে হবেই। কল্যাণী মায়ের এই সাহস দেখে চোখের জল মুছে হেসে বলে উঠল—আচ্ছা মা, চলো এবার, বইগুলোও তো কিনতে হবে নাকি!

লটারি

মহীতোষ ভৌমিক
শিক্ষাকর্মী

মা আমাকে দশ পয়সা দাও না!

দশ পয়সা ! তুই কি করবি দশ পয়সা নিয়ে?

লটারি কাটব।

আরে দুষ্টু ছেলে তুই কী লটারি কাটবি? না না, পয়সা-টয়সা হবে না। তোকে লটারি কাটতে হবে না।

আমাদের স্কুলের মাস্টারমশাই ছোট্টো ছেলে বিল্টু, এখনও স্কুলের পড়াশুনো শেষ হয়নি ওর, বছর পাঁচেক বয়স হবে। মাস্টারমশাই স্কুলের একটি ঘরে পরিবার নিয়ে থাকেন। পৌষ পার্বণের আগের দিন, সকাল বেলায় মাস্টারমশাই স্কুলের দাওয়ায় কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে পড়াতে বসেছেন। ছা-পোষা মানুষ, সে সময় মাস্টারমশাইদের বেতন তেমন কিছু ছিল না। মোটামুটি দিন চলে যায়।

স্কুলের পাশ দিয়ে পাকা রাস্তা গিয়েছে। তার দুপাশে ছোটোখাটো বাজার, ছোট্টো বিল্টু খবর পেয়েছে আজ পৌষ পার্বণ উপলক্ষে বাজারের কয়েকজন মিলে লটারি খেলা শুরু করেছে। বড়োরা অনেকেই ওই দশ পয়সার লটারি কাটছে। বিল্টুরও মাথায় ঝোঁক চেপেছে সেও লটারি কাটবে। তাই বাড়িতে ছুটে এসে মায়ের কাছে বায়না করেছে দশ পয়সা দিতে হবে। যে সময়ের কথা বলছি তখন দশ পয়সাতে একটা চপ পাওয়া যেত। এর থেকে তখনকার দশ পয়সার মূল্য সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

সে যাইহোক, মা তো ওইটুকু ছেলেকে কিছুতেই পয়সা দেবে না। বলল- যা তোর বাবাকে বল। বাবা ছেলের বায়না শুনে জানাল—লটারি কাটতে হবে না। যাও, এখন আমি পড়াচ্ছি। বিল্টু আবার মায়ের কাছে গেল। কান্নাকাটি করে অবশেষে সে দশ পয়সা আদায় করল। তারপর ছুট্টে পৌঁছল লটারির দোকানে। বড়োরা অনেকেই লটারি কাটছে। সেও বলল—আমি লটারি কাটব। নাম লিখে নিল ওরা। কী মজা বিল্টুর। লটারি লাগবে কি না জানে না, কিন্তু লটারি যে কাটতে পেরেছে তাতেই সে খুশি!

(২)

লটারিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার আছে। সেটা কী জানো? তিনটে বিশাল সাইজের নারকেল। পৌষ পার্বণের সময় তো। একটা বড়ো সর্ষের তেলের টিন নেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে যতজন লটারি কেটেছে তাদের নাম লেখা কাগজ রেখে দেওয়া হল। এইবার ভিড়ের মধ্য থেকে একজন ছেলেকে ডেকে নেওয়া হল, সেই কাগজ তুলবে। তার চোখদুটো কাপড় দিয়ে ভালো করে বেঁধে দেওয়া হল। সবার মধ্যে একটা উৎসুক ভাব কী হয়, কী হয়। কার কপালে লটারি লাগে।

ছেলেটিকে বলে দেওয়া হল ওই টিনের ডাব্বা থেকে পর পর তিনটি নাম লেখা কাগজ তুলবে। প্রথম যার নাম উঠবে সে প্রথম পুরস্কার, তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়।

চারদিকে ভিড়। সকলের মধ্যে উৎকণ্ঠা। এদিকে বিল্টু ভিড়ের ভেতরে ঢুকতে পারছে না। সবাই শুধু চিৎকার করছে—নামটা বলো। নামটা বলো। একজন জোরে বলে উঠল—সৌমেন দাস। যার নাম উঠল সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

হাততালির বন্যা। বিল্টু কিছুই বুঝতে পারছে না। শুধু দাঁড়িয়ে আছে।

(৩)

এবার দ্বিতীয় নাম তোলার পালা। তার আগে আবার ভালো করে কাগজগুলোকে নাড়িয়ে দেওয়া হল। আবার সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে দ্বিতীয় কে হয়।

কাগজ তোলা হল। তাতে লেখা রয়েছে--বিল্টু মাইতি। দ্বিতীয় পুরস্কার বিল্টু পেয়েছে জেনে সবাই ওকে খুঁজতে লাগল। সে আনন্দে কেঁদে ফেলল।

তৃতীয় পুরস্কার পেল একজন বয়স্ক ব্যক্তি। সকলের হাতে একে একে পুরস্কার তুলে দেওয়া হল। যেহেতু বিল্টু সবচেয়ে ছোটো তাই পুরস্কারসহ ওকে কোলে তুলে সকলে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

Wings of Poesy

কাব্যশিল্পপঙ্খ

A New Dawn

Aditi Jana
Assistant Professor, Department of English

Have you heard the shriek of the dying?
Have you seen the cries of the living?
Have you noticed the world locked down?
A NEW NORMAL!..They say.
Is the world running to its doomsday?
Stop. Pessimism leads to nihilism.

Have you heard about solidarity?
Have you seen humanity?
Have you felt people share other's cares?
Do gauge ki doori…! They say.
Nothing creates distance among hearts.
A phoenix never dies. So does the world.

Hush! A new dawn is waiting. . .
A post-Covid world greets us. India wakes up
With the rhapsodic news of the Commonwealth medals.
India wakes up with the laughter of the schoolboys and girls
India wakes up with *Janaganamana* ringing in the hearts,
India wakes up with saffron, green and white colours,
India wakes up with splendid dreams of the fundamental rights,
India wakes up with her sleepless *jawans* at the Borders,
India wakes up with new tales of women empowered.
Seventy five-year-old Indian legacy heralds a new history.
It inspires, informs, illuminates.

বিদ্যালয়ের শিক্ষাগুরু

সাহিদা সুলতানা
বাংলা বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

হাঁপিয়ে গেছি ক্লাসের দেওয়া অনেক পড়া পড়তে,
ঝিমঝিম ঝিম করছে মাথা পদ্ম এখন গড়তে।
এইখানেতেই বলে রাখি হাসির কয়টি কথা,
কেউ ভেবো না কারো প্রাণে দিচ্ছি কোনো ব্যথা।
প্রার্থনাতে স্কুলের পোশাক নাই যদি যাই পরে,
অদিতি ম্যাম বার করে দেন চুলের মুঠি ধরে।
সুদীপা ম্যাম অঙ্ক ক্লাস নিতেন প্রতিদিন,
টেক্সট বই-এর অঙ্ক করান গোনা গুনতি তিন।
সুতপা ম্যাম মধুমিতা ম্যাম বাংলা ক্লাস নেন,
কথা বললে রেগে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন।
ইংরেজি ম্যাম কাকলি দাস সদাই হাসি খুশি,
পড়া না পারলে রেগে বলেন-- মারব পিঠে ঘুষি।
সুজাতা ম্যাম ভালো ভীষণ কিন্তু খুবই কড়া,
ভৌতবিজ্ঞান ক্লাসে এসে ধরেন শুধু পড়া।
নিন্দ্রা ম্যাম যত্ন করে পড়ান ইতিহাস,
পরীক্ষার আগে কেবল সাজেশনেই পাশ।
দেবু বাবু স্বপন বাবু আরো আছেন যাঁরা,
সবাই মিলে বহতা এই শিক্ষা-নদীর ধারা।
এরা যেমন শাসন করেন, ভালবাসেন তেমন,
এক দিন না স্কুলে গেলে মনটা করত কেমন।

আবেশ

মামনি মিশ্র পান্ডা
প্রাক্তন ছাত্রী

বৃষ্টি ভেজা মিষ্টি আবেশ,
মাখছে কারোর পাখা।
মল্লার গায়ে বাতাস বুঝি,
সবুজ আভায় আঁকা।

বৃষ্টি পড়ে টুপ-টাপ-টুপ
সবুজ ঘাসের প্রাণ,
চাতক পেল তৃষ্ণাবারি,
ঘুচল অভিমান।

পাখির সারি পাখনা মেলে,
অজানা ঠিকানা...
সোহাগি পথ যত্নে দেখাও
নিবিড় কামনায়।

আবেশ ভরে ভ্রমর ওড়ে
গাইছে প্রিয় প্রাণ
মেঠো সুরের অঞ্জলিতে
পদাবলির গান!

কথকতা

সপ্তর্ষি পাত্র
বাংলা বিভাগ, প্রাক্তন ছাত্রী

অন্তরে যত লুকিয়ে ছিল কথা
ভাসিয়ে দিয়েছি নদীর খরস্রোতে—
ঢেউ ভেঙে যায় মনের অন্ধকারে
সাজানো ঘর তাসের মতো ঝরে।

আমাদের সেই প্লাবন উচ্ছ্বসিত
আবেগের ফেনা ছিন্নভিন্ন করে
নৃত্যের তালে তালে অবিরত,
স্মৃতি সাজিয়েছি থরে বিথরে।

পালিয়ে চেয়েছি যেতে সুদূর দেশে
ইচ্ছে নদীও বুঝি মৃতপ্রায় আজ
ধূসর ক্লান্তি নামে বিষাক্ত বাতাসে
ঝরে যায় পাতা, শুধু একা গাছ!

ভালোবাসি মা

সুস্মিতা পাল
পদার্থবিদ্যা বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

'মা' শব্দে মিশে থাকে অশেষ ভালোবাসা
যা আমার কাছে উৎকর্ষের অন্য নাম
স্বার্থবোধ ছাড়াই যে আগলে রাখে সবসময়
আমার সমস্ত ভালোবাসা তোমাকেই দিলাম।

নিজে না খেয়ে খাবার এগিয়ে দাও আমাদের
স্নেহের আঁচলে আগলে রাখো সমস্ত যন্ত্রণা
হাতে স্লেট-খড়ি দিয়ে লিখতে শিখিয়েছ বলেই
আজ কলেজে পড়ি, হাজার স্বপ্নের জাল বোনা।

তুমি আমার প্রিয় শিক্ষক, তোমায় জানাই প্রণাম-
আমার মা, আমার দেশ, আমার সর্বনাম!

নারী

অর্পিতা সিংহ
ভূগোল বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

নারী মানে দুরন্ত উদ্যম, তুমুল আবেগ
স্নেহ আর আদরে জীবনের বেগ
ভালোবাসা ঘিরে রাখে দিন প্রতিদিন
বিধাতার দান তুমি সহজ স্বাধীন

যথাযথ শ্রদ্ধা নিয়ে বেঁচে থাকো তুমি
প্রিয় জননী আর পুণ্য জন্মভূমি
প্রতিদিন তব গাথা এই কথা জানা
আকাশে উড়াল দেবে স্বপ্নের ডানা।

ফিরে পাওয়ার আশা

লিলি দাস
দর্শন বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

যে আকাশটা তোমায় ঘিরে স্বপ্ন আঁকে মেঘের রঙে,
সেই নীলাকাশ একলা হয়ে ঘুরে বেড়ায় তোমার সনে।

যে ছেলেটা তোমায় নিয়ে মহানন্দে খেলা করে,
সেই ছেলেটাই তোমায় ছাড়া বন্ধ থাকে অন্ধ ঘরে।

যে নদীটা তোমার সাথে ঢেউ তোলে সুর তাল মিলিয়ে,
সেই নদীটাই তোমায় ছাড়া বেখেয়ালে যায় হারিয়ে।

তোমায় ছাড়া স্তব্ধ সবই তোমার আকাশ তোমার নদী,
বাতাস এখন ভারাক্রান্ত, তোমায় ছাড়া অচল সবই।

আজ যে সব থমকে গেছে মহামারির জন্য
আবার সেজে উঠুক জগৎ আদতে অনন্য।

কালো মেয়ে

তনুশ্রী ঘোড়ই
ইংরেজি বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

জন্মের পর থেকেই শুনছি
আমি কালো।
সমাজের চোখে নই ভালো।
এই সমাজ নাকি খুব ভদ্র, শিক্ষিত
তাহলে কালো মেয়েরা কেন আজও অবহেলিত?

শোনো রং দেখে বিচার হয় না কিছু
ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা হয় জীবনের বাণী
মা কালীকে পুজো করে লোকে
আমরা শক্তির প্রসাদ বয়ে আনি।

স্বাবলম্বী হয়ে ওঠো, কালো মেয়ে সবে
আলো হয়ে মেতে উঠি জীবন উৎসবে।

স্মৃতি

বাণী মাজী
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

কয়েকটা দিন কয়েকটা রাত
কিছুতে যায় না ভোলা
হিসেবের খাতা পূর্ণ হয় না
থেকে যায় পথ চলা।
পেয়েছি কত নতুন প্রশ্ন
রঙিন স্বপ্ন প্রাণের
আরো কত কিছু পেতে পারি
মন কি সব জানে?

হারিয়ে গেল ছেলেবেলা
বড়ো হওয়ার ফাঁকে
ছবির পরে থাকছে ছবি
স্মৃতির ভরা তাকে
সময় স্রোতে ভাসছে তরী
দূরের পথে হায়
অনুভবের রঙিন খাতায়
জীবন লিখে যায়!

স্বাধীনতার মানে

প্রিয়াঙ্কা বর্মন
ইংরেজি বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

স্বাধীনতা মানে কি ইংরেজদের চলে যাওয়া শুধু?
আজও বাংলার প্রতিটি ঘরে পরাধীন নরনারী।
অনাহারে অবহেলিত অগুনতি কঙ্কালসার মানুষ,
পরনে শুধুই ছিন্নবস্ত্র-কোথায় তাদের স্বাধীনতার পোশাক?
দু-মুঠো ভাতের আশায় দিন চলে যাদের
একশ্রেণীর মানুষের কাছে যারা প্রতিদিন অত্যাচারিত হয়
তাদের কাছে কী মানে স্বাধীনতার?

স্বাধীনতা কি তাদের জীবনে আসেনি...

আগমনী দুর্গা

অর্পিতা বর্মন
রসায়ন বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

শরতের সাদা মেঘে আকাশ ছেয়েছে--
শিউলি ফুলের গন্ধে সবার মন মেতেছে।
দূর থেকে ভেসে আসে ঢাকের আওয়াজ,
খুশি করে দিল আমাদের মন ও মেজাজ।

শতশত মানুষের আনাগোনা চলে
মণ্ডপ ভরে ওঠে ফুলে আর ফলে
মহাষ্টমীর মন্ত্রে জেগে ওঠে প্রাণ
মাইকে বেজে চলে প্রিয় চেনা গান

বিসর্জনের সেই বিদায়বেলায়—
হাসিমুখ ভেসে যায় দুখের ভেলায়...

সর্বজয়া নারী

সুদীপ্তা দাস
ইংরেজি বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

নারী তুমি আজ দিগ্বিজয়ী
তুমি সবার মা, মমতাময়ী
তুমি নয়তো পরনির্ভরশীল
বরং তোমাতেই জগৎ সংসার।

কখনও তুমি নরম, শান্ত
প্রয়োজনে তুমিই দুরন্ত।
দশভুজা তুমি নারী
প্রতিবাদে প্রতিরোধে সরব।

এভারেস্ট ছুঁতে পারো তুমি
যেতে পারো মহাকাশ
পুরুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে
গড়ে তোলো নিজস্ব ঘর।

নারী তুমি হয়ে ওঠো আত্মনির্ভর।

শিক্ষক-শিক্ষিকা

সুস্মিতা বেরা
ইংরেজি বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

মানব সভ্যতার এক উজ্জ্বল দীপশিখা
শিক্ষক-শিক্ষিকা।
আমাদের চেতনার চাবিকাঠি তাঁদেরই হাতে-
অগ্রগতির মানে পথ চলা একসাথে।

বাবা-মায়ের মতো শ্রদ্ধা করি তাই
ভালোবাসা আর স্নেহের আশিস চাই।
অব্যাহত থাকুক জীবনের গতি-
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জানাই প্রণতি।

বিদায় বেলায়

শিল্পা সামন্ত
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, প্রাক্তন ছাত্রী

বিদায় বেলার ক্রান্তিলগ্নে ভারাক্রান্ত মনে।
কোন্ ভাষাতে বলব 'বিদায়' ভাবছি ক্ষণে ক্ষণে।

মনে পড়ে হাজার স্মৃতি সাধের ক্লাসরুম
জ্ঞানের পথে এগিয়ে চলা হাসিখুশির ধুম

ভালোবেসে ভরসা যোগান শিক্ষাগুরু যাঁরা
প্রণাম করি শ্রদ্ধা জানাই মহানুভব তাঁরা।

সবার কাছে ভিক্ষা করি প্রাণের আশীর্বাদ
জীবনযুদ্ধে জয়ী হব এটুকুই তো সাধ!

নারীর স্বাধীনতা

পম্পা মান্না
দর্শন বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

স্বাধীনতার স্বাদ নারীর কপালে বোধহয় আর জুটল না।
শুধু নারীর ভাগেই কেন লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা?
এ কেমন দেশ আমার, কেমন মানুষের বিচার।
ধর্ষণ যেখানে তুচ্ছ ঘটনা, হচ্ছে শুধুই অনাচার !
এদিকে মা দুর্গার কাছে নত হয়ে তুমি করো জোড়হাত;
ওদিকে দেবী রূপে নারীর সম্মান হচ্ছে কেন ধূলিসাৎ?
ছোটো শিশু ভালোভাবে কথা ফোটেনি যার;
সেও আজ পাশবিক অত্যাচারের শিকার।
তুমি নারী প্রতিটা পদক্ষেপ যে তোমার বড্ড ভারি
কিন্তু মনে রেখো—
আমরাই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি।

বাবা

রাজশ্রী ভৌমিক
বাংলা বিভাগ, প্রথম সেমেস্টার

'বাবা' শব্দটির মধ্যে সবাই ভরসা খুঁজে পায়।
আমি সেই ভরসা হারিয়ে ফেলেছি।
কেননা আমি আমার বাবাকে হারিয়েছি।

খুব কষ্ট হয়, মনে পড়ে তোমাকে।
রোজ রাতে একটা চাপা কান্না আমায় ঘুমোতে দেয় না,
চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে।

ঘুম নেই চোখে একলা শূন্য ঘরে,
বাবা মনে পড়ে--
তোমায় খুব মনে পড়ে।

যেই মানুষটা আঙুলে আঙুল ছুঁয়ে,
জীবনের পথ চলা শেখাল,
নিজে না খেয়ে, আমাদের খাবার তুলে দিল,
যে কিনা আমাদের সকল খুশির কারণ;
তার খুশি?
না, আমরা কোনোদিন অনুভব করিনি।

শেষ কিছু দিন বাবার যে কষ্ট,
সবকিছু এখনও স্পষ্ট মনে আছে।
একদিকে খেতে না পারা, কথা বলতে না পারার কষ্ট,
অন্যদিকে শেষ ইচ্ছেগুলো পূরণ করতে না পারার দুঃখ-

বাবা বাঁচতে চেয়েছিল খুব...
কিন্তু ক্যান্সার এমন একটা অসুখ,
পারলাম না তাকে আর ফিরিয়ে আনতে।

না ফেরার দেশে চলে গেল বাবা
খালি পড়ে রইল অসহায় বৃদ্ধা মায়ের কোল—
স্মৃতি আর চোখের জল...
বাবা তোমাকে মনে পড়ে
খুব মনে পড়ে।

দুঃসময়

পূজা রানী কুইল্যা
দর্শন বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

বাঁকের মুখে নৌকা যখন
ছুটল বেগে ঢেউ,
ডাক দিও না, ডাক দিও না
ডাক দিও না কেউ।

এ যে মোদের জীবনতরী
চলে স্রোতের টানে,
সময় কোথা ফিরে দেখার
ছুটি কীসের পানে।

মোদের জীবন দুখে ভরা
একটুখানি চাওয়া--
দুমুঠো ভাত একটু নুন
এটাই পরম পাওয়া।

রাতের আছে অনেক তারা
চাঁদের আছে আলো,
আঁধার ভরা দুয়ার তবু
জ্বালো রে দীপ জ্বালো।

চাইনি মোরা অনেক অর্থ
চাই না অঢেল সুখ,
শান্তি থাকুক ভালোবাসার
মায়ের হাসিমুখ।

জীবন

অঙ্কনা প্রধান
পদার্থবিদ্যা বিভাগ, প্রাক্তন ছাত্রী

জীবন মানেই মিষ্টি মধুর
হাসি খেলার ঘর,
জীবন মানেই দুঃখ কষ্ট
বন্ধু আপন পর।

জীবন মানেই ওঠাপড়া
হার কিংবা জিত--
চলতে হবে কেবল জানি
থামাটা নয় ঠিক।

জীবন মানে চলার পথে
হরেক রকম গান,
দুঃখ পেলেও থাকব ভালো
স্বপ্ন অফুরান।

আগমনী

সুস্মিতা খাটুয়া
বাংলা বিভাগ, প্রাক্তন ছাত্রী

নীল আকাশে সাদা মেঘের দল
ভোরবেলায় শিশিরের ছোঁয়া
কাশের বনে হিল্লোল--
খুশির উড়ান

সারা বছর অপেক্ষার পর
ঘরে ফেরার গান...

আলোর প্রসাদ

সমন্বিতা ভীম
বাংলা বিভাগ, প্রাক্তন ছাত্রী

জীবন একে অন্যের জন্য
দান আর প্রতিদানে ধন্য
মানুষ কি বুঝতে পারবে
মন মানে সবুজ অরণ্য...

শুভগুণ সকলের আছে
তাই নিয়ে মানুষের কাছে--
প্রাণ দিয়ে সুধা বিতরণ
যেভাবে ফল দেয় গাছে।

নিজের জীবন বুঝি যুদ্ধ
প্রাণপণে সব হবে শুদ্ধ--
আলোর প্রসাদে জানাজানি,
ভালোবাসা আদতে সম্বুদ্ধ।

বন্ধু

শ্রাবণী দাস
দর্শন বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার

বন্ধু মানে মেঘলা দুপুর
বৃষ্টিভেজা গান,
বন্ধু মানে একটু রাগে
একটু অভিমান।

বন্ধু মানে একলা আকাশ
চাঁদের আলোর মন--
বন্ধু মানে তোমার আমার
সাধের আপনজন।

সবুজে ঘেরা পৃথিবীটা

জয়শ্রী ভক্তা
রসায়ন বিভাগ, প্রাক্তন ছাত্রী

শ্যামল-সবুজে ঘেরা
প্রকৃতি মায়ের হাতে গড়া,
একদা পৃথিবী ছিল সুখ-শান্তিতে ভরা।
ছিল না হিংসার কোনো ছাপ
হয়ত ছিল না প্রকৃতির অভিশাপ।
কিন্তু সভ্যতার শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ
আজ হারিয়েছে মান আর হুঁশ।
নিত্যনতুন আবিষ্কারের নেশায়
বায়ুমণ্ডল ভরে গেল কালো ধোঁয়াশায়।

প্রতিদিন ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে মাটি
আমরা কংক্রিটের পথে হাঁটি।
এতদিন প্রকৃতি সহ্য করেছে বিলকুল
ভেবেছিল মানুষ শুধরে নেবে ভুল--
কিন্তু না আর নয়, প্রকৃতি গিয়েছে রেগে
মহামারি বুঝিয়েছে বিনিদ্র রাত জেগে—
প্রকৃতি যদি বাঁচে তবে বাঁচবে সবাই
দূষণহীন পৃথিবীর স্বপ্ন বুনে যাই।

কন্যাশ্রী

সুনেত্রা ভৌমিক
দর্শন বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী
এনেছেন কন্যাশ্রী প্রকল্প--
মেয়েদের লেখাপড়া পিছোবে না আর
শুধু এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প।

অল্প বয়সে করব না আর বিয়ে
পড়াশুনো করে হব জয়ী
এই প্রকল্প সার্থক অনুপ্রেরণায়--
নতুন পথের দিশারী।

আমি গর্বিত আমি নারী

সৌমিতা মিশ্র
পদার্থবিদ্যা বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

আমি নারী
লড়াই করতে পারি
আমরা বিধাতার অনন্য সৃষ্টি
কারো বধূ, কারো বোন, কারো মা
আমরা সবেতেই সম্পূর্ণা—

শত বাধা শত যন্ত্রণা
তবু ভেঙে পড়া চলবে না
আঘাতের বিপরীতে প্রত্যাঘাত জরুরি
আমি নারী!
আমরা গর্বিত, জীবনের কাণ্ডারী!

পাথরকুচি

কাকলি ঘোড়াই

বাংলা বিভাগ, তৃতীয় সেমেস্টার

আমি এক অতিক্ষুদ্র, তুচ্ছ, অনাকর্ষণীয় সামান্য পাথরকুচি গাছ।
বসতি আমার স্কুলের বাগানে।
সবার অলক্ষ্যে, অযত্নে, অবহেলায় নিত্য দিনপাত আমার...
নিত্য হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর!

হঠাৎ একদিন তোমার মনের বাগানে পেলাম ঠাঁই--
সারাজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন পূর্ণ হল।

এদিকে তুমি বাল্য থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হলে,
প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই রুচিবদল ঘটল তোমার।
আজ মুগ্ধ হও না আর পাথরকুচির মুগ্ধতায়।
মন মেতেছে এখন গোলাপের সৌরভে...

আমি নিশ্চিত জানি হৃদয়ের শুদ্ধতায়
একদিন ঠিক উপলব্ধি করবে তুমি,
ভালোবাসা আর মোহের ফারাক।
ততদিনে দেরি হয়ে যাবে কি না কে জানে!

চাওয়া পাওয়া

অন্তরা ব্যানার্জী
বাংলা বিভাগ, প্রাক্তন ছাত্রী

জগৎ জুড়ে হরেক মানুষ
কেউ ধনী, কেউ গরীব
বাঁচার অধিকার আছে সকলেরই
শুধু চাই একটু সহমর্মিতা--

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই বরং
যার আছে আর যার নেই দুজনেই
বেঁচে থাক ভালোমতো।

সুন্দর হোক পৃথিবী--
শোষণমুক্ত হোক সমাজ।

শারদীয়া

মধুরিমা চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ

ছাতিমের বন্ধ মেখে শারদীয়া আসে।
উচাটন কিশোর প্রেমের শব্দে শরতের ভোর,
মহালয়ায় বাজতে থাকা আগমনীর একটি সুর...
হারিয়ে যাওয়া রাজবাড়ির অন্তরালে,
বন্ধ কারখানার শ্যাওলাটে গলির গন্ধরাজ গাছে,
দুই বিনুনি এক বিনুনিদের অবিরাম খেলার সঙ্গে,
আধো-আলোয় ছোটোবেলার অতল বিস্মৃতিচারণের সূত্রে।

এক অদ্ভুত মনখারাপের সুরে শারদীয়া
তুমি চলে যাবে বলেই হয়তো
আকাশে ছুটির বাঁশি...

আমাদের ঋতুবৈচিত্র

পিঙ্কি পাত্র

গণিত বিভাগ, প্রথম সেমেস্টার

কালের নিয়মে প্রকৃতির বুকে ঋতুদের আসা যাওয়া
তারই মাঝে আমাদের প্রাণে সবাইকে কাছে পাওয়া।

বৈশাখ মাসে প্রখর গ্রীষ্মে সকলের গায়ে ঘাম,
এল না বৃষ্টি, কেমন সৃষ্টি, গাছে গাছে পাকা আম।

আষাঢ়ের সাথে শ্রাবণের ধারা নদী-নালা জলে ভরা,
চারদিকে শুধু কান্নার রোল, জলে ভাসে কত মড়া।

বর্ষার পরে পুজো পুজো ভাব শরতের হাতছানি,
সকলের মনে খুশির তুফান উৎসব ভাব জানি।

কার্তিক মাসে রাজকীয় বেশে কার্তিক পূজা পায়,
অঘ্রানে তার লেশ থাকে না, হেমন্ত ছুটে পালায়।

এসে গেল পৌষ এসে গেল শীত পিঠে পায়েসের ধুম—
যত গায়ে দাও লেপ কম্বল তবুও আসে না ঘুম।

বসন্ত এসেছে কোকিলের ডাকে দখিন হাওয়াটি বেশ,
চড়কের ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে, আমার ছড়াও শেষ!

Pearls of Wisdom

জ্ঞানের মণিমুক্তো

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের দ্বারা আধুনিক রোগের উপশমের উপায়ের বিশ্লেষণ

দেবব্রত বেরা

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

সাম্প্রতিককালে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি মহামারির বীভৎস রূপ। দুবছরেরও বেশি সময় ধরে করোনার সঙ্গে লড়াই করে আমরা অভ্যস্ত জীবনে ফিরেছিলাম। কিন্তু এখন আবার নতুন করে করোনা বিষয়ে ভাবতে বাধ্য হচ্ছি আমরা। এই সংকটাপন্ন সময়ে আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, সনাতন ধর্মের পুরাণ উপনিষদ কিংবা বেদে কি এই ধরনের সংক্রমণের চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো আলোচনা আছে?

চারটি বেদের মধ্যে অথর্ব বেদে চিকিৎসা সংক্রান্ত আলোচনা আছে। মূলত ভেষজ আয়ুর্বেদই ছিল চিকিৎসার মাধ্যম। সম্ভাব্য সাড়ে তিন থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে বেদগুলি রচিত হয়। মন্দিরগুলো ছিল আয়ুর্বেদ চর্চার পীঠস্থান। এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কি করোনা, রুবেলা, স্প্যানিশ ফ্লু নিয়ে কিছু বলা আছে? আসলে এই নামগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের দেওয়া, বেদ যেহেতু দেবনাগরী ভাষায় রচিত তাই এই লক্ষণযুক্ত রোগের নাম অন্য শব্দে ছিল। ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার নাম ঋষিরা দিয়েছিলেন দৃশ্য ও অদৃশ্য কৃমি ইত্যাদি।

তাঁরা কি মহামারি সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন? অবশ্যই বলেছিলেন। এবং এর নাম খুবই বিবেচনা করে দিয়েছিলেন 'জনপদ ধ্বংস'। শাস্ত্রের একটি অধ্যায় আছে জনপদ ধ্বংস নামে। চরক সংহিতায় আছে মহামারির কারণ চারটি-- জল, বায়ু, দেশ, কালের দূষণ। এদের মধ্যে কালের দূষণ যে ভয়ঙ্কর তা বলা আছে। কাল দূষণ হলে অপেক্ষা করতে হবে আগামীর জন্য, কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয় এই সময়। আর এই মহামারি করোনা, কাল দূষণের ফল। কাল দূষণের ফলে যে জনপদ ধ্বংস(মহামারি) হয়, তা প্রধানত অধর্মের ফল। অধর্ম কেন হয়? প্রজ্ঞাপরাধের কারণেই অধর্ম হয়। প্রজ্ঞার অধীনে থাকা ধী, ধৃতি, স্থিতি এই তিনটির সঠিক উপযোগ না হলে প্রজ্ঞাপরাধ দেখা দেয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক – আমরা জানি বেশি তেলমশলা খাবার শরীরের পক্ষে ভালো না, তবু খাই। জানি যে একটি গাছ একটি প্রাণ, কিন্তু গাছ কাটলে পরিবর্তে আর একটা গাছ লাগাই না ইত্যাদি। এই যে জেনেও জ্ঞানপাপীর মতো আচরণ করি এটিই প্রজ্ঞাপরাধ।

বর্তমান সমাজ কীভাবে প্রজ্ঞাপরাধ করে চলেছে তার উদাহরণ ব্যাপক। যথেচ্ছ গাছ কাটা, যানবাহনের বাড়বাড়ন্ত, কলকারখানা দ্বারা নদী দূষণ, পরমাণু বোমা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদি। প্রকৃতি কি সব মেনে নেবে? এই অপরাধ প্রতিকারের তিনটি উপায় আছে, তা হল – **১) রসায়ন সেবন ২) পঞ্চকর্ম চিকিৎসা ৩) সৎ বৃত্ত পালন।**

১) রসায়ন সেবন: যে ভেষজ গ্রহণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, জরাকে প্রতিরোধ করা যায় তাই রসায়ন সেবন। এর আবার তিনটি ভাগ- **ক) নৈমিত্তিক রসায়ন:** বিভিন্ন ব্যাধি হলে যে ভেষজ ওষুধ ব্যবহার করা হয়। জ্বর, কুষ্ঠ, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত রসায়ন। **খ) কাম্য রসায়ন:**

কিছু কাম্য করে ব্যবহৃত ভেষজ। যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধি, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করার জন্য কাঁচা হলুদ, খাওয়া হয়। **গ) আজস্মিক রসায়ন:** জেনে বা না জেনে আমরা প্রতিনিয়ত যে রসায়ন সেবন করে চলেছি। যেমন দুধ, মধু, ঘি, তুলসী, বাসক পাতা ইত্যাদি ব্যবহার করি। এগুলো শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে আমাদের রক্ষা করে।

২) পঞ্চকর্ম চিকিৎসা: পাঁচ ধরনের চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে। পদ্ধতিগুলি হল –

প্রথমত **বমন:** বমন করিয়ে চিকিৎসা।

দ্বিতীয়ত **রেচন:** দেহের দূষিত পদার্থ বহিষ্কৃত করে চিকিৎসা

তৃতীয়ত **বস্তি:** দুধরনের বস্তির মাধ্যমে চিকিৎসা। পায়ুদ্বারের মধ্যে ওষুধ প্রয়োগের চিকিৎসা।

চতুর্থত **নস্যকর্ম:** নাকের মাধ্যমে দূষিত পদার্থ বের করে দেওয়া।

পঞ্চমত **রক্তক্ষরকর্ম:** এই রক্তক্ষর পরিশোধন এবং বিভিন্ন ব্যাধি চিকিৎসায় সহায়তা করে।

৩) সৎ বৃত্তিপালন: এটি হল সঠিক কাজ। হিংসা, লোভ না করা, নিষ্ঠুর না হওয়া, অভুক্তকে অন্ন দান করা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শারীরিক মানসিক, সামাজিক কল্যাণ মূলক কাজ করা যায়।

শাস্ত্রের মূল মন্ত্রে সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তারপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যিনি অসুস্থ হয়েছেন। ভারত সরকারের আয়ুষ্মন্ত্রক থেকে সংসমানি বটি খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যা গুলঞ্চ, শুঁটপিপুল, মুথা, চিরতা, কালোমেঘ প্রভৃতি দ্বারা তৈরি। এছাড়া গুলঞ্চ চূর্ণ দিনে তিন-চার মাত্রা খাওয়া, চিরতা ভিজিয়ে তার জল সেবন, তুলসী পাতা, গোলমরিচ-মধু মিশিয়ে রোজ সকালে সেবন করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

এবারে আসা যাক আইসোলেশন, কোয়ারান্টাইন, সোস্যাল ডিস্ট্যান্সিং-এর কথায়। প্রাচীন ভারতে রোগ জীবাণুর ধ্বংস লীলার প্রতিরোধে এই দাওয়াইয়ের প্রয়োগ হত। মহামারি ঠেকাতে রোগীকে পরিবার সমেত অন্তরীণ করে আলাদা রাখার কথা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হয়েছে। চরক ও সুশ্রুতসংহিতা অবলম্বনে লেখা 'অষ্টাঙ্গ হৃদয়' এ মহামারি রোধে একুশ দিন লকডাউনের কথা বলা হয়েছে। জীবাণুতে যখন সভ্যতা বিপন্ন, তখন প্রতিটি রোগী ও তার সংস্পর্শে আসা মানুষকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে। যা আজ সারা বিশ্ব অনুসরণ করছে। **'একবিংশোতিরাত্রেনবিষং শ্যাম্যতি সর্বথা'** অর্থাৎ একুশতম রাতে বিষের উপশম হয়।

সুশ্রুতসংহিতাতে আক্রান্তের বাড়ি, শয্যা, আসন, অলংকার ও ব্যবহার্য জিনিস ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। সুশ্রতসংহিতার ছয় নম্বর অধ্যায়ের ৩২ এবং ৩৩ নম্বর শ্লোকে জনপদ ধ্বংসের উপসর্গ হিসেবে কাশি, বমি, নাক দিয়ে জল পড়া ইত্যাদির উল্লেখ আছে। এটি সংক্রমিত হয় স্পর্শের মাধ্যমে, কাশির মাধ্যমে, একই থালায় ভোজন, একই বিছানায় শয়নের মাধ্যমে। **'উপসর্গিক রোগশ্চ সংক্রমন্তি নরানরং'।** আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে কত উন্নত ছিল এই চিকিৎসা ব্যবস্থা। ক্রমে বহিরাগত আক্রমণে, পাশ্চাত্য অনুকরণের দাসত্ব মানসিকতা প্রভৃতি কারণে আয়ুর্বেদের এই ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আয়ুর্বেদ পরিষদের সভাপতি ডঃ প্রদ্যোৎবিকাশ কর মহাপাত্র বলেছেন চরক ও সুশ্রুতসংহিতা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হত। অগণিত শিক্ষার্থীর হাত ধরে এই সমস্ত গ্রন্থের প্রতিলিপি চীন তিব্বত ও অন্যান্য পূর্ব এশিয়ার

দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই তো ওই সমস্ত দেশগুলিতে ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের এত প্রভাব।

WHO কিংবা ভারত সরকার যা যা ব্যবস্থা এই করোনা প্রতিরোধে নিয়েছে, তার কিন্তু শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। যেমন- সুস্থ মানুষের রক্ষার্থে অসুস্থ মানুষকে অন্যত্র সরানো। এটি নিয়ে শাস্ত্রে আরো নিখুঁত আলোচনা করা আছে। যাইহোক, আমরা যদি আমাদের বেদগুলিকে গুরুত্ব সহকারে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারতাম, অনুশীলন করতে পারতাম, তাহলে কোনো জনপদধ্বংসের সম্ভাবনাই থাকত না। আধুনিক শিক্ষার নামে আমরা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও চিকিৎসা পরম্পরা ধরে রাখার চেষ্টা করিনি। আজ সময় এসেছে আবার সেই গৌরব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার। যে লকডাউন চলছে তাকে গুরুত্ব দিয়ে পালন করা জরুরি। ধীরে ধীরে পৃথিবীর এই অদ্ভুত আঁধার কেটে আবার আলো ফিরে আসবে ভগবানের কাছে এই কামনা করি।

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ
সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ
সর্বে ভদ্রাণী পশ্যন্তু
মা কশ্চিদ্ দুঃখ ভাগ্ ভবেদ্।।

সন্দর্ভ-গ্রন্থ-সূচি

১. ‘অষ্টাঙ্গহৃদয়’ অরুণদত্ত, হেমাদ্রী, সম্পাদক ভিষগাচার্য হরিশাস্ত্রী পরাড়কর, চৌখাম্বা ওরিয়ন্টাল, বারাণসী।

২। ‘চরক সংহিতা’ চক্রপাণিদত্ত টীকা, যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য, চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী।

৩। ‘দ্রব্যগুণবিজ্ঞানম্’ শ্রী যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য, চৌখাম্বা ওরিয়ন্টাল, বারাণসী।

৪। ‘বৈদ্যক বৃত্তান্ত’, গুরুপদ হালদার, ১৯৫৪

৫। ‘কুলদর্পণম’, ডঃ ত্রিভঙ্গমোহন সেনশর্মা, প্রথম সংস্করণ, বহরমপুর নিউ আর্ট প্রেস, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ

৬। ‘বনৌষধি দর্শিকা’, শ্রী ঠাকুর বলবন্ত সিংহ, বারাণসী, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৭৭

৭। ‘বনৌষধি শতক’, রামনাথ বৈদ্য বারাণসী, অষ্টম সংস্করণ-১৯৮৩

৮। ‘বৈদ্যক শব্দসিন্ধু’, শ্রী কবিরাজ উমেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত, চৌখম্বা ওরিয়ন্টাল, তৃতীয় সংস্করণ-১৯৮৩

৯। ‘সুশ্রুত সংহিতা’, টীকা ডলহ্ন, সম্পাদক-যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য, চৌখম্বা ওরিয়ন্টাল, চতুর্থ সংস্করণ-১৯৮০

১০। ‘History of Ancient Bengal’, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৭১।

Science Safari

বিজ্ঞান অন্বেষা

The Chemistry of Fire

Sadaf Rifa Khan

Dept. of Chemistry, 5th Semester

"Fire was the greatest discovery of Mankind. But before the first man discovered that fire, there was a human who dreamt of that fire." - Johnpaul K.

Introduction

A fire has formed an important ingredient of societal cultures and religions, from historic times to our present world and has played a key role in the advancement towards civilization. The fire has taken different trends all through the history of our world.

For thousand of years, people have used fire in several ways, such as cooking, generating heat and light, signaling, keeping warm during cold days, cleaning land in griculture, cremation and driving machines etc. However, many people know what fire can do, but few know what it is? Fire is an uncontrolled combustion involving chemistry, thermodynamics, fluid mechanics and heat transfer.

Definition and classes of Fire

Definition: A state or instance of combustion in which fuel or other material is ignited and combined with oxygen, giving off light, heat and flame.

Classes: There are four classes of fire.

Class A: Ordinary solid combustibles such as paper, wood, cloth and some plastics.

Class B: Flammable liquids such as alcohol, ether, oil, gasoline and grease, which are best extinguished by smothering.

Class C: Electrical equipment, appliances and wiring in which the use or a nonconductive extinguishing agent prevents injury from electrical shock. Don't use water.

Class D: Certain flammable metallic substances such as sodium and potassium. These materials are normally not found in the Medical Center.

Is Fire a 'Matter' or 'Energy'

Since matter can be defined as "anything which occupies space and has mass or weight", we can say fire is 'matter' because it occupies space and since it is a mixtures of gases, it must have some mass.

The light and the heat produced by the flame is 'energy'.

Fire Triangle

The fire triangle or combustion triangle is a simple model for understanding the necessary ingredients for most fires.

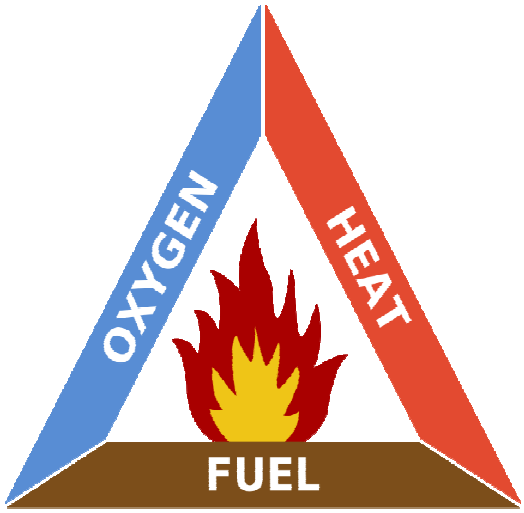

The triangle illustrates the three elements a fire needs to ignite: heat, fuel and oxidizing agent (usually O_2). A fire naturally occurs when the elements are present and combined in the right mixture. A fire can be prevented or extinguished by removing any one of the elements in the fire triangle. For example, covering a fire with a fire blanket blocks oxygen and can extinguish a fire. In large fires where firefighters are called in, decreasing the large amount of oxygen is not usually an option because there is no effective way to make that happen in an extended area.

Combustion

"Fire is the visible consequenceof the burning process, Combustion." It is an redox reaction whereby the structures of complex substances are reduced in size. They then form more stable molecules through the reorganization of atomic bonds. It has been noted that a major aspect of the chemistry of combustion at high temperature entails radical reactions; nonetheless combustion reaction can also take place as a single overall reaction. For example: $H_3C\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + 5O_2 = 3CO_2 + 4H_2O + \text{heat}$

In the above oxidation-reduction reaction, the resulting products, carbon dioxide and water are more stable than oxygen and propane. Similar to any other chemical reaction, a catalyst can be used to speed up the combustion process. Since,the reaction will be at a high activation energy level, the incorporation of a catalyst makes it possible to operate at a lower temperature,which leads to complete combustion.

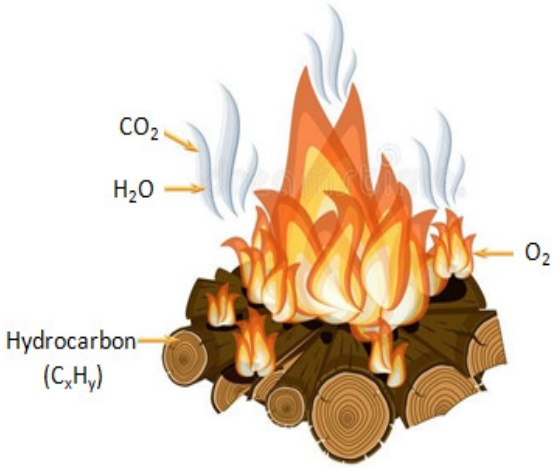

As pertains to solid burnable materials, the activation energy makes it possible for vapourization or pyrolysis of the burnable to take place and the gas

generated will then combine with an oxidizer giving yeild to a burnable mixture.The reaction is usually self-sustainable when the energy generated by the burning process exceeds or is equivalent to the amount of energy needed for the burning to take place.

Fire in terms of thermodynamics

Thermodynamics , as the branch of science that deals with the nature of heat and its to conversion to other types of energy , can be used to describe fire. Generally, a thermodynamic system is defined by variables such as temperature, pressure, as well as other properties and it considers both the system and its environment.

When there is uncontrolled combustion , the environment within the vicinity of the combustible material will have heat sources with limitless heat capacity. This makes it possible for the environment to give and receive heat while maintaining its temperature constant.

If the condition alters , the thermodynamic system reacts by altering its state . That is the temperature, pressure and volume will alter accordingly so as to maintain the original state of equilibrium. A changing system can adhere to any of the three laws of thermodynamics.

For a system, to receive energy, the surrounding has to make it available. On the other hand, a system giving out energy provides it to the surrounding. The energy is simply converted from one form to another as the transfer occurs. However, the energy can never be created nor destroyed; therefore, this means that as the combustion takes place, the products of combustion, such as heat and light, are simply being converted from their innate state.

1st Law of Thermodynamics

1st law of thermodynamics states that "Energy cannot be destroyed or created but can be transformed from one state to other. This law is also known as the law of conservation of energy."

For Example: when gasoline (a combustible substance) is consumed in the engine of a vehicle, an equivalent quantity of work and heat are given out as the energy is produced.

Heat generated from the engine which is converted into other forms of energy, raises the temperature of the surroundings as well as the parts of vehicle and the change of all the energies produced from the burnt gasoline would be equivalent to the change in energy between the reactants and the products.

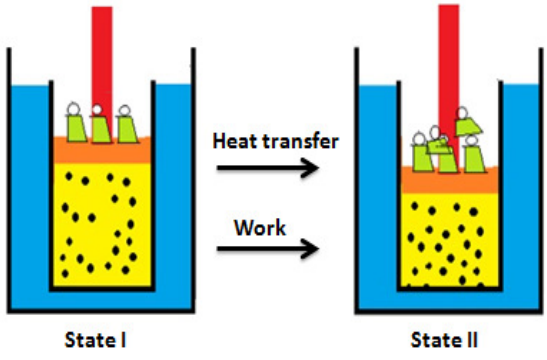

2nd Law of Thermodynamics

It states that "Since heat energy exhibits entropy, it cannot spontaneouly move from a region of lower temperature to a region of higher temperature." For example, when a hot object is placed in contact with a cold object, heat flows from the hotter one to the colder one, never spontaneously from colder to hotter.

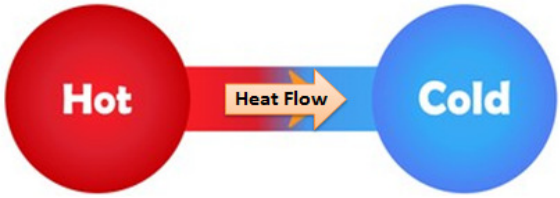

3rd Law of Themodynamis

It states that all processes stop as the temperature nears absolute zero; therefore fire cannot take place at this temperature since the production of energy is not possible.

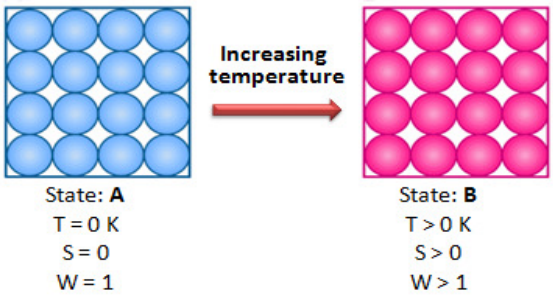

Fluid Mechanics

Aspects of Fire

Fluid mechanics is also applicable here. The layer of hot air expands across the upper borders of a compartment. At the same time, the energy in that layer also radiates outward.This process has an effect on the fluids below the gas layer and away from the spot where the fire commenced.

Heat Transfer

Heat transfer alludes to the physical process through which thermal energy is conveyed from an area at a higher temperature to an area at a reduced temperature and this difference in temperature is what necessitates the transfer of heat. The heat transfer takes place depending on the capability of the material to exchange heat energy.

This is called the thermal conductivity of an object.In general ,a material having a higher thermal conductivity exchanges heat at a faster rate .It is important to note that the exchange occurs until the material and its surroundings have attained the same thermal conditions.

Heat transfer in fluids particles

Heat exchange mainly takes place in three ways: "Conduction, Convection and Radiation". But in fluids the transfer of heat occurs through conduction and convection only.

Conduction

Fluids are made up of molecules that interact with each other; i.e. the discrete molecules are always in motion. This elastic impact in fluids allows the fire to transfer its heat energy from one place to the other.The transfer of heat through conduction occurs when heat moves due to the direct contact of molecules in a fluid.

It is important to note that the process of free electron dissemination,which is most

common is solid materials, can also result in the exchange of heat energy.In fluids,the transfer of heat through conduction takes place when neighboring atoms collide with one another.

The movement of electrons from one atom to the subsequent one can also result in this. Conduction is the main method of heat exchange from the point of origin of the fire to the materials that surround it.

Convection

As the burning process continues and fire spreads through fluid circulation, convection then becomes the main mode of heat exchange-density differences between the fluid cause the medium to flow. The less-dense gases are able to rise through the buoyant flow.

Consequently, as the fire grows, the hot plume gaseous substance coming from the fire rises because it is less dense, while the colder air sinks and gets into close contact with the fire that enables it to gain heat and become less dense.

This process, in which the hot air rises and the cooler air sinks ,leads to the development of a convective current within the vicinity of the fire. Transfer of heat is achieved when hot fluids release their energy through an encounter with other materials.

Radiation

Radiation, as a process in which electromagnetic waves travel from a heat source to an absorbing material, makes the impact of a completely grown fire to be felt as it exerts heat energy all around a hot material. The transfer of heat through this method does not require any medium of transmission.

Conclusion

Fire has been important for humans ever since they evolved about two million years ago. Fire provides energy for our ancestors to find food or avoid predators safely.The ability to effectively manage and manipulate fire has led to many great life enhancements such as heating, themanagingof landscapes, smoke signalling. Fire removes low-growing underbrush, cleans the forest floor of debris, opens it upto sunlight and nourishes the soil. Reducing the competition for nutrients allows established trees to grow stronger and healthier. Thus, Fire is a discovery which is keeping us alive even today.

References

DeHaan J. D. (2007). Kirk's fire investigation(6th ed.). Upper Saddle River, N J: Pearson Education.

Fermi, E. (1956). Thermodynamics . New York : Dover.

Quintiere, J.G. (1998). Priciples of fire behavior. Albany, NY: Delmar Publishers.

University of Maryland University College. (n.d.). Fire analysis.

Types of Stars

Mahadeb Pal

Assistant Professor, Dept. of Physics

"Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky"

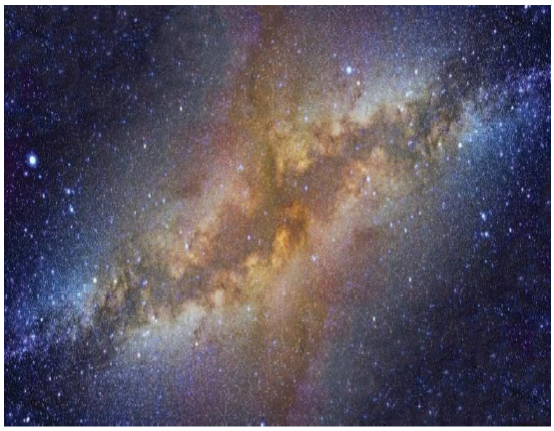

We've all heard that the twinkling tiny flecks of light in the sky are stars, just like our own Sun. That can lead us to believe that all of those stars are the same. According to Dr Elizabeth Stanway of Warwick's astronomy and astrophysics research team, there are many different types of stars, and we can see the majority of them in the night sky.

We distinguish star types based on brightness and colour. It's difficult to judge brightness unless we know how far away something is. Colour is easier to see, and you can use telescopes, binoculars, or even a cardboard tube to block out stray light and help you focus on the star itself. There are numerous online tools (such as the object search at In-the-sky.org) that can help you determine where to look for any specific star from your location and at the time you are awake.

Solar-type Stars

A Solar-type star has roughly the same mass as our Sun and its core is combines hydrogen into helium. The result is a long-lived, stable star with a lifetime of billions of years, as well as the familiar yellowish glow that characterizes many of the stars we see in the sky.

Alpha Centauri, the brightest Solar-type star in the sky, is very close to us. Alpha Cen is actually a binary system, with the brighter component only slightly larger than our own Sun. Alpha Cen, unfortunately, is in the southern hemisphere.

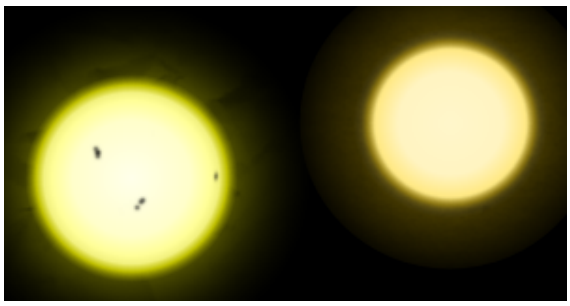

Dr. Solanki and colleagues told that "We were very surprised that most of the Sun-like stars are so much more active than the Sun,"

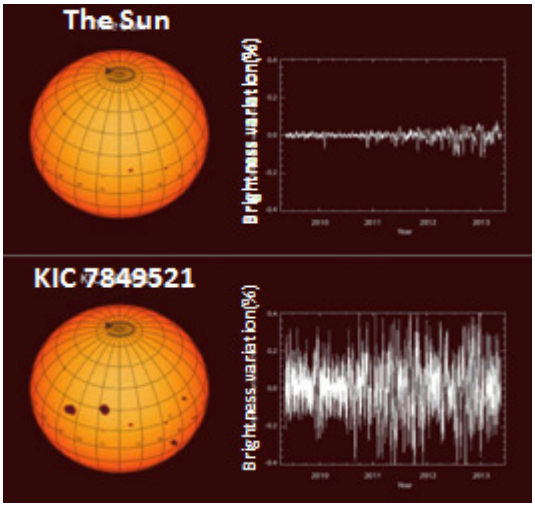

Cayrel de Strobel (1996) defines three types of stars like the Sun: Solar-type (or Solar like) Stars, Solar Analogous Stars, and Solar Twins. The physical properties that define a star are its mass, composition, and age, but none of these are fully or directly observable. Furthermore, angular momentum and companionship are significant influences on the behaviour of stars such as the Sun and should not be overlooked.

Hot Blue Stars

Stars are much larger than our Sun burn hotter but for a shorter period of time, living and dying within a few million years. As a hot gas flame burns blue, so do these stars, and because they're so bright, we can see a lot of them from the ground. An example in the sky is the bright star Spica in the constellation of Virgo.

Red Dwarf Stars

Stars those are much less massive than our Sun burn cooler and live for much longer periods of time - potentially hundreds of billions of years. The resulting dull red stars are the most common type in our galaxy, but they're difficult to see since they're so dim. The nearest red dwarfs are probably Proxima Centauri and Barnard's Star, but both of these are too faint to see with the naked eye. If you have a small telescope you can see the Barnard's Star.

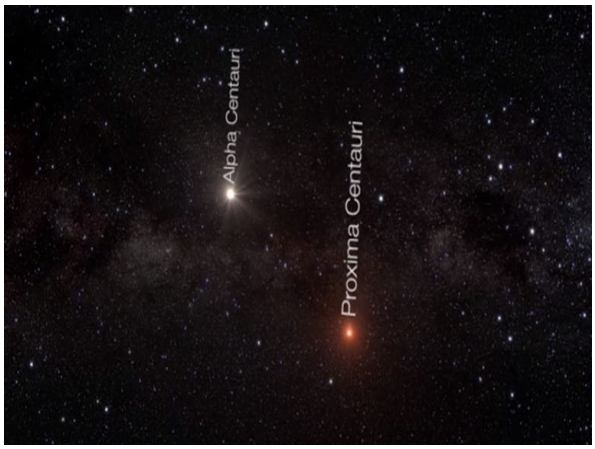

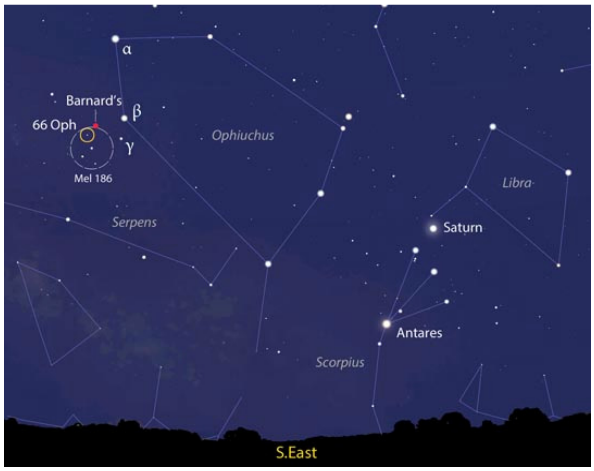

Red Giant Stars

When a star's core runs out of hydrogen fuel, it must adjust and find alternate ways to power itself; one method is to begin burning hydrogen outside the core, which causes the star to swell. As a result, we have a cool, puffy red giant star. Because these stars are so massive, they are very bright, and we can see several of them in our skies. As the hydrogen is used up, these stars can start burning helium and then heavier elements in their cores, heating up and producing blue and yellow supergiant's and hypergiants.

Again, there are examples of these visible in the night sky. Arcturus is a very large red giant star.

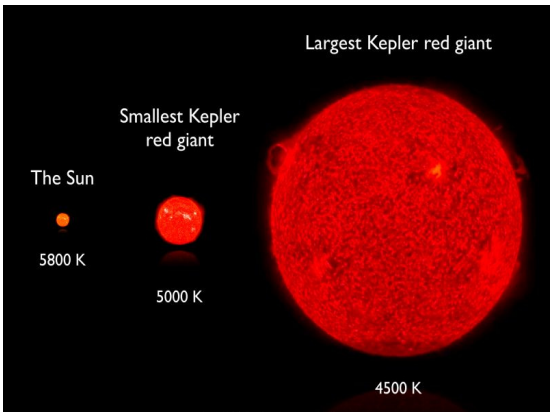

White Dwarfs

When a star about the size of our Sun or slightly larger has burned through all of its material, it collapses into a new type of object, a kind of giant crystal supported by quantum physics (specifically, electron

degeneracy pressure) rather than its own heat. The result is a very small star, about the size of Earth, that is very hot but very faint called white dwarf. Since these stars are so small and emit a lot of their light in the ultraviolet part of the spectrum they can be very hard to see in our skies.

Neutron Stars

Neutron star is one type of compact star thought to be primarily composed of neutrons. The radius of neutron stars is typically 20 km (12 miles). Their masses range from 1.18 to 1.97 times that of the Sun, with the majority being 1.35 times that of the Sun. As a result, their mean densities are extremely high approximately 10^{14} times that of water.

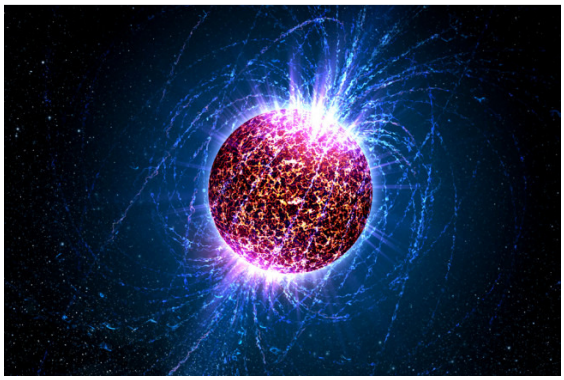

Key to Success

সাফল্যের চাবিকাঠি

The Key to Academic Success : Practical Advice for Students

Yasmin Chaudhuri

HOD, Assistant Professor of English

"Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow."

Anthony J. D'Angelo

A learner is a person who is actively engaged in the process of learning, which involves acquiring new knowledge, skills, and abilities. There are several qualities that can make someone a good learner: Curiosity: Good learners are curious about the world and are motivated to learn new things, Attention to detail: Good learners pay close attention to detail, which allows them to understand and remember new information more effectively, Persistence: Good learners are persistent and don't give up easily. They are willing to put in the time and effort necessary to learn something new, Adaptability: Good learners are adaptable and open to new ideas and ways of doing things, Organization: Good learners are organized and have good study habits, which helps them to stay on track and make the most of their learning time, Initiative: Good learners take initiative and are proactive in their learning. They don't wait for others to tell them what to do, but are willing to seek out new learning opportunities on their own and Collaboration: Good learners are able to work well with others and are open to feedback and suggestions from their peers. Overall, a good learner is someone who is proactive, persistent, and open to new ideas, and who takes an active and organized approach to learning.

Here are some crucial tips and strategies for effective learning:

- Set learning goals: Clearly define what you want to learn and why. This will help in yourfocus and motivation.

  Find a suitable learning environment: Create a learning environment that is conducive tolearning, such as a quiet space with minimal distractions.
- Take effective notes: Take notes while you are learning new material. This will help you process and retain the information.
- Use multiple learning modalities: Use a variety of learning modalities, such as reading, listening, and hands-on practice, to engage different parts of your brain and enhance your understanding of the material.
- Practice active learning: Engage with the material by asking questions, participating

in discussions, and doing hands-on activities. This will help you internalize and retain the information better.

Here are some academic advices for students:

- Start studying early: Don't wait until the last minute to start studying. Instead, start reviewing material a few weeks before the exam to give you plenty of time to absorb and understand the material.
- Create a study plan: Make a plan for how you will study for each exam, including how much time you will spend studying each day and what material you will cover.
- Review notes and materials regularly: Review your notes and other materials regularly, rather than trying to cram everything in just before the exam. This will help you retain theinformation better.
- Take breaks: It's important to take breaks while studying to rest your brain and avoid burnout. Take a short walk or do something fun to give your brain a break.
- Get a good night's sleep: Make sure to get a good night's sleep before the exam to ensure that you are well-rested and able to concentrate.
- Eat well and stay hydrated: Eating well and staying hydrated can help you stay focused and energized while studying.
- Stay positive: Believe in yourself and your abilities. Negative thoughts or self-doubt will only hold you back.
- Seek help if needed: If you are struggling with the material or have questions, don't be afraid to ask for help. Talk to your teacher or a tutor, or seek out additional resources online or in your school library.

GET ORGANIZING!

- Create a schedule: Make a schedule that includes not only your classes and assignments, but also time for studying, relaxation, and other activities. This will help you stay on track and prioritize your tasks.
- Use a planner or calendar: Use a planner or calendar to keep track of due dates, appointments, and other important events.
- Keep your workspace organized: Keep your desk and study space organized and free of clutter. This will help you with your focus and you will be more efficient.
- Use folders and binders: Use folders and binders to keep your papers and materials organized and easy to find.
- Take good notes: Take thorough and organized notes while you are in class or studying. This will make it easier to review and understand the material later on.
- Break down big projects into smaller tasks: If you have a big project or assignment, break it down into smaller, more manageable tasks. This will make it feel less overwhelming and help you stay

on track.

- Set small, achievable goals: Set small, achievable goals for yourself and celebrate your progress along the way.

By following these organization tips, you can improve your efficiency and productivity and feel more in control of your academic work.

LOVE AND CHERISH YOURSELF!

Mental and physical healths are important for students to be able to thrive academically and personally. Good mental and physical health can help students to concentrate, learn effectively, and feel motivated and engaged in their studies. In contrast, poor mental and physical health can negatively impact a student's ability to learn and succeed. Self-care is an important aspect of maintaining good mental and physical health. It includes taking care of your emotional, physical, and mental well-being. Some self-care activities that students can engage in include getting enough sleep which is important for physical and mental well-being (Aim for 7-9 hours of sleep per night), eating a balanced diet that includes a variety of fruits, vegetables, and other nutrients that can help one feel energized and focused, exercising can help to improve physical and mentalhealth as well as reduce stress, improve mood, and enhance cognitive function, making time for relaxation and stress-reduction activities, such as meditation, yoga, or deep breathing and, finally, building and maintaining positive relationships with friends, family, and other supportivepeople to improve mental health and well-being.

By prioritizing mental and physical health and engaging in self-care activities, students can improve their overall well-being and succeed academically.

স্নাতকের পর কী করবে

পর্ণা রায়

সহকারী অধ্যাপিকা, পদার্থবিদ্যা বিভাগ

ছাত্রছাত্রীরা যারা এখন স্নাতক স্তরে পড়াশুনো করছে তাদের প্রায় সকলের মনেই কম বেশি যে প্রশ্নটা আসে তা হল এরপর কোন পথে তারা জীবনে এগিয়ে যাবে, কীভাবে তারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। স্নাতক স্তরের পর অনেক রাস্তাই খোলা থাকে। কিন্ত সঠিক রাস্তাটা সবসময় বেছে নেওয়া সহজসাধ্য হয় না। অনেকেই আবার তাদের জীবনের লক্ষ্যে স্থির থাকে। কিন্ত যারা বুঝতে পারে না কোন্ পথটা তাদের জন্য সবথেকে বেশি উপযুক্ত, মূলত তাদের জন্যই আজকের এই আলোচনা। খুব বেশি জটিলতার মধ্যে আমরা যাব না। স্নাতক স্তরের পর কোন্ কোন্ সম্ভাবনা আমাদের জন্য খোলা থাকে সেটাই খুব সহজভাবে আলোচনা করব।

সবার আগেই তোমাদের সামনে খোলা আছে উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশুনোর রাস্তা। ভারতের প্রচুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশুনোর সুযোগ আছে। রাজ্যের দিকে তাকালেও দেখা যাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশুনোর সুযোগ আছে। স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশুনোর পর গবেষণার দ্বার অবারিত। অর্থাৎ এর পর Ph.D-র সময়। কত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে গবেষণা হয় তা গণনা করা মুশকিল। আলোচনা শুরু করা যাক পদার্থ বিদ্যা দিয়ে। যে প্রশ্নটা মনে ঝড় তোলে খুব ছোটো থেকে What was before that? অর্থাৎ এর আগে কী ছিল? কীভাবে তৈরি হল এই বিশ্ব ? Big Bang কেন ঘটেছিল? Dark Matter কী ? Dark Energy কী? জানি এই প্রশ্নগুলো তোমাদের মধ্যে উদ্দীপনা তৈরি করে নিয়মিত। কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছো কী করে এই বিষয়ের কাছাকাছি যাওয়া যায়। আলোচনা চলতে পারে রসায়ন নিয়েও। Plastic র বিকল্প কি? আরো কী কী নতুন নতুন chemical আমাদের জীবনে আসতে চলেছে। অঙ্কের প্রশ্ন তো সর্বব্যাপী। ব্যাংকের সিকিউরিটি, পদার্থবিদ্যার কঠিন অঙ্ক সবেতেই অঙ্কের ভূমিকা মেনে নিতেই হবে। M.Sc এবং PhD একত্রেও করা যায়। যাকে Integrated PhD বলা হয়। B.Sc র পর কিছু সর্বভারতীয় প্রবেশিকার মাধ্যমে যেমন JOINT ADMISSION TEST FOR MASTERS (JAM), JOINT ENTRANCE SCREENING TEST (JEST) বিভিন্ন IIT গুলোতে সরাসরি ভর্তির সুযোগ মেলে। নতুন তৈরি হওয়া IISER, NIT এর মত গবেষণা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানেও ভর্তির সুযোগ মেলে JAM পরীক্ষার মাধ্যমে।

B.Sc. র পর কেউ যদি Technology বা Engineering র পথে প্রবেশ করতে চায় তার জন্যও সুযোগ আছে, যেমন B.Sc B.Tech। বহু ছাত্রছাত্রী B.Sc. র পর B.Tech. নিয়ে পড়াশুনো করে কর্মজীবনে প্রবেশ করে। কারোর যদি computer নিয়ে আগ্রহ থাকে তাহলে সে

Master of Computer Application (M.C.A.) কোর্সে অংশ নিতে পারে। কেউ যদি Techonology এবং Core Course-এর মাঝামাঝি রাস্তা নেয় তাহলে DRDO এবং Aeronautical Engineering নিয়ে পড়াশুনো করতে পারে। বিজ্ঞানের পাশাপাশি কলাবিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও তাদের পছন্দের বিষয়ের ওপর গবেষণা করতে পারে।

কেউ যদি স্নাতক স্তরে পড়াশুনোর পর মনে করে জীবিকার পথে প্রবেশ করবে তাহলে দেখা যাক তাদের সামনে কী কী রাস্তা খোলা ?

প্রথমেই আসা যাক সিভিল সার্ভিসের আলোচনায়। সিভিল সার্ভিসের মাধ্যমে কেউ প্রশাসনিক পদের সাথে যুক্ত হতে পারে। তার জন্য তাকে সর্বভারতীয় স্তরে UPSC অথবা রাজ্যস্তরে WBCS পরীক্ষায় বসতে হয়। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন informative lecture শোনা, নিয়মিত Newspaper পড়া, current affairs সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। এছাড়া History, Politics, Civics এবং Geography র ওপর দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রচুর বই পড়া আবশ্যিক। স্নাতক স্তরে পড়াশোনার পাশাপাশি এই পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করা যেতে পারে।

কেউ যদি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পথে প্রবেশ করতে চায় তাহলে B.Ed./D.El.Ed. কোর্সে অংশগ্রহণ বাধ্যতামুলক। এরপর তাকে School Service (রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় স্তরে) অথবা Primary Entrance এ বসতে হবে। কলেজে শিক্ষকতার জন্য স্নাতকোত্তরের পর NET/SET উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যিক। এরপর College Service Commission অথবা Public Service Commission এর মাধ্যমে কলেজে পড়ানোর সুযোগ মেলে।

এছাড়া বিভিন্ন Competitive Exam র মাধ্যমে Bank, Rail এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চাকরির সুযোগ মেলে। এছাড়া বিভিন্ন Short Term Professional Course করা যেতে পারে। Vocational Course-এর সাহায্যেও বিভিন্ন Industry-র সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া Digital Marketing, Hotel Management, Interior Designing, Animation ইত্যাদি নিয়েও পড়াশুনো করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। চারপাশ সম্পর্কে একটু ওয়াকিবহাল থাকলেই প্রচুর সুযোগ পাওয়া যায়। নিজেকে ওয়াকিবহাল রাখার জন্য তোমরা বিভিন্ন professional publications পড়তে পারো, বিভিন্ন social media forum এ অংশগ্রহণ করতে পারো ।

সব শেষে এটাই বলার যে, এখন থেকেই নিজেদের প্রস্তুত করা শুরু করতে হবে। লক্ষ্যে যদি স্থির থাক সাফল্য আসবেই।

Future aspects of Opto-electronics and Photonics

Sayan Bag

Assistant Professor, Dept of Physics

This document is made for the students, who are pursuing a bachelor degree in physics, computer science, or a bachelor degree program in technologies related to the mentioned subject. Throughout this document, we provide information on the subject called 'Photonics' and opportunities related to that.

Introduction

In the beginning, I would like to talk about a few research institutes and universities inside India where you may find Optics, Optoelectronics and Photonics studies or degree program. As an example, we can find University of Calcutta, Rajabazar Science College, IIT Delhi, IIT Guwahati, IIT Madras etc. In IIT Delhi one might find also Ph.D. positions in Photonics. But you should also think about the scopes that you can/may consider for yourself outside India. It is difficult to get admission with a full scholarship but not impossible. So get ready and prepare yourself.

About the subject and studies

Optoelectronics (or Photonics) is a very special branch of physics (optics) and it deals with both theoretical fundamental research and technological break-through. It has become a very popular topic to study and do research on the subject. Before we come into details about the subjects I would like draw the attention of the reader towards the usage of optoelectronic devices that we encounter in our daily life. The common ones are the LED remotes of our televisions, air-conditioners, the fibre of optic broadband, Solar Panels, X-ray machines in hospitals etc. Most of the optics related to any kind of displays, such as mobile, television, virtual reality displays etc. are being studied within the scope of studies of Photonics. Applied optics on the other hand is also used to design various optical devices like smart LED lights, Headlights of the cars, street lights etc.

Optical design is a branch of Photonics and is a demanding subject now. In this branch, you might learn how to design a telescope or any other camera. For example, the James Webb Space Telescope, a masterpiece, is also designed by optical designer. In the Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO), the gravitational

wave was also detected by an optical method (precise interference of two coherent beams) The optical design of an imaging system becomes generally complicated as the number of lenses (reflective or refractive surfaces) in the system increases. This is why an optical camera or a micro- scope is so expensive. There are also other industry and medical related optical devices, such as spectral camera or endoscope.

Quantum computers might be the next generation computers for us and probably will be able to compute certain problems way faster than that of today's digital computers. Q bits are the fundamental bits that one must realize in practice to perform quantum computation. There are several ways to realize Q-bits and optical Q-bits play a major role in this regard.

White light splits into its spectral constituents (colours) while passes through a dispersive medium is well known (called dispersion). But, in nature, there are other phenomenon too where a light beam with single wavelength (or quasi-monochromatic) can generate white light (or broadband). The phenomena are known as the super continuum generation. It is a nonlinear optical process and a nice illustration is shown below figure.

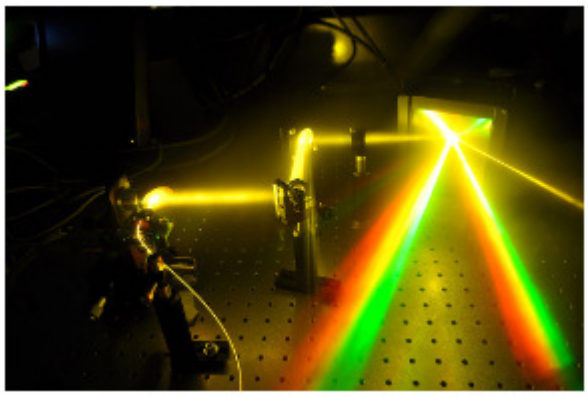

Figure: Super continuum generated by injecting femto second pulses from a titanium: sapphire laser at 800nm into a photonic crystal fiber. The super continuum is dispersed using a diffraction grating onto a screen. Although we see only the visible portion of the spectrum, the super continuum wavelength range actually extends from below 500nm into the IR beyond 1500nm.

Source: https://spie.org/news/5802-supercontinuum-solitons-and-instabilities?SSO=1

I should also mention at this point that this Photonics technology also deals with the design of a variety of devices, which works following the phenomena called light matter interaction. In particular, these devices are able to convert light energy into electrical energy and vice versa. So, we can already see that this subject is interesting and there are many opportunities to study fundamental physics related to optics and applications.

Master's degree programs in Photonics, world-wide: There are lots of universities and Research institutes offering master degree in photonics and other related subjects for the students who have done graduation of B. Tech. in photonics and optoelectronics all over the world. The links of few of those institutes are mentioned in this article as below.

i) Institute of Photonics, Finland. https://sites.uef.fi/photonics/

ii) Tampere University, Finland. https://www.tuni.fi/en/study-with-us/tampere-university-studies/masters-programmes

iii) Abbe School of Photonics, Germany. https://www.asp.uni-jena.de/master

iv) Chalmers University of Technology. https://www.chalmers.se/en/Pages/default.aspx

v) Max Planck School of Photonics. https://photonics.maxplanckschools.org/en/home

vi) University of Central Florida College of Optics and Photonics. https://www.ucf.edu/college/optics-photonics/

Conclusion: We have discussed very briefly about the study on Photonics and Optoelectronics in this article. From the future aspect all we can say that people are showing much more interest in doing Ph.D.'s in this subject because of the various effective branches of this subject. In this era of quantum computing and automation industry Optoelecronics is going play a massive role. Not only for the educational purpose but in a carrier oriented thought we can say that there are lots of renowned companies all over the world who are trying to build up technology based on this subject and also encouraging bright and interested people to do so.

Navigating the Path to Success: Career Tips for Students

Yasmin Chaudhuri

Assistant Professor, Dept. of English

Graduating from college is a significant milestone, and many students face the question of what to do next. In India, there are a wide range of courses that students can pursue after graduation, each offering its own unique set of opportunities and challenges. These courses range from traditional fields such as business and engineering, to more unconventional options such as fashion design and animation. In this essay, we will explore the various courses that are available to students after graduation in India, examining the eligibility criteria, admission process, and career prospects for each one. By understanding the options available, students can make an informed decision about the course that is right for them and their future career goals.

Off-beat courses

After graduation, students might opt for courses that cater to their passion**."**Off-beat courses**"** are considered unconventional or non-traditional. Here are a few examples of off-beat courses that students can pursue after graduation in India:

Performing arts: Students who have a passion for the performing arts can pursue courses in music, dance, theatre, or film. These courses are typically offered at specialized institutes or universities.

Culinary arts: Students who have a passion for food and cooking can pursue courses in culinary arts, which teach the skills and techniques needed to become a chef or work in the food industry.

Photography: Students who have an interest in photography can pursue courses in this field, which teach the technical and creative aspects of photography.

Fashion design: Students who have an interest in fashion and design can pursue courses in fashion design, which teach the skills needed to create and produce fashion products.

Animation and visual effects: Students who have an interest in animation and visual effects can pursue courses in this field, which teach the skills needed to create animations and special effects for films and other media.

Writing and journalism: Students who have a talent for writing and an interest in journalism can pursue courses in these fields, which teach the skills needed to write and report on various topics.

Most of these programs in India require applicants to have completed at least 10+2 (high school) education. Some programs may also require applicants to have completed a degree in the related field; Admission to the above programs is usually based on a combination of factors, including academic performance, relevant work experience, and an interview or entrance exam.

Here are a few examples of institutions that offer the above courses in India, along with their admission fees (note that fees are subject to change and may vary based on the specific program and institution):

Culinary arts: Institute of Hotel Management, Catering Technology, and Applied Nutrition (IHM): This institute, which is affiliated with the Ministry of Tourism, Government of India, offers a range of culinary arts programs at its campuses in various cities across India. Admission fees for these programs range from INR 50,000 to INR 1,50,000 per year.

Journalism: Indian Institute of Mass Communication (IIMC): This institute, which is located in Delhi, offers a range of journalism programs at its campus. Admission fees for these programs range from INR 50,000 to INR 1, 50,000 per year.

Photography: National Institute of Photography (NIP): This institute, which is located in Mumbai, offers a range of photography programs at its campus. Admission fees for these programs range from INR 50,000 to INR 1,50,000 per year.

Fashion design: National Institute of Fashion Technology (NIFT): This institute, which is located in various cities across India, offers a range of fashion design programs at its campuses. Admission fees for these programs range from INR 50,000 to INR 1,50,000 per year.

Animation: National Institute of Design (NID): This institute, which is located in Ahmadabad, offers a range of animation programs at its campus. Admission fees for these programs range from INR 50,000 to INR 1,50,000 per year.

Performing arts: National School of Drama (NSD): This institute, which is located in Delhi, offers a range of performing arts programs at its campus. Admission fees

for these programs range from INR 50,000 to INR 1,50,000 per year.

Social Media

In this rapidly evolving world of technology and communication, Social media has become an increasingly important aspect of modern society and has created a range of career opportunities for students. Some options for students interested in pursuing a career in social media include:

Social media manager: A social media manager is responsible for creating and implementing a company's social media strategy. This includes creating content, engaging with followers, and analyzing the effectiveness of social media campaigns.

Social media influencer: A social media influencer is a person who has a large following on social media platforms and uses their influence to promote products or ideas.

Social media analyst: A social media analyst is responsible for analyzing data from social media platforms and using it to inform marketing and business strategy.

Social media strategist: A social media strategist is responsible for developing and implementing a long-term plan for using social media to achieve business goals.

Social media marketer: A social media marketer is responsible for creating and executing social media marketing campaigns to promote products or services.

Social media content creator: A social media content creator is responsible for creating engaging content for social media platforms, such as posts, photos, and videos.

Business

Another fantastic avenue for students, after their graduation, to foray into is the world of business. Starting a small business at home with no funding can be challenging, but it is not impossible. Here are a few tips for students who want to open a small business at home with no funding:

Start small: When starting a business with no funding, it is important to keep overhead costs low. Consider starting with a small, home-based business that requires minimal upfront investment, such as a freelance service or an online store.

Use your existing skills and resources: Think about the skills and resources you already have and how you can use them to start a business. For example, if you are a talented baker, you could start a home-

based bakery using your own kitchen and equipment.

Utilize free resources: There are many free resources available to help you start a business, such as business planning templates and marketing tools. Take advantage of these resources to help you get started.

Look for low-cost financing options: If you need a little bit of funding to get your business off the ground, consider looking for low-cost financing options, such as grants or loans from non-profit organizations or crowd funding platforms.

Be creative: Starting a business with no funding requires creativity and resourcefulness. Think outside the box and come up with creative ways to get your business off the ground.

It is important to note that starting a small business at home with no funding will require a lot of hard work and dedication. It may also take longer to get the business off the ground, but with persistence and determination, it is possible to succeed.

হাল ছেড়ো না

শচীনাথ বেরা

সহকারী অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ

মনের জোর আর অদম্য ইচ্ছাশক্তির উপর ভর করে যারা অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন তাদের মধ্যে Karoly Takacs অন্যতম। তাঁর জীবনকাহিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করে। তিনি ছিলের একজন পিস্তল শুটার। ১৯১০ সালে হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল অলিম্পিকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা। I can. Yes, I can. এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তিনি তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি একজন বিশ্বমানের শুটার হিসাবে নিজের যোগ্যতার পরিচয় রাখেন। দেশের বিভিন্ন শুটার প্রতিযোগিতায় খেতাব জয়লাভ করেন। ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু ভাগ্য তাঁর সহায় হল না। কারণ দেশের সেনাবাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী কেবলমাত্র commissioned পদাধিকারীরা অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু তিনি সেইসময় সার্জেন্ট পদে কর্মরত ছিলেন তাই সেই যাত্রায় দেশের হয়ে অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করতে পারলেন না। এই ঘটনায় তিনি মর্মাহত হলেন কিন্তু হতাশ হয়ে পড়লেন না, বরং পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন। অবশেষে, ১৯৩৮ সালে সেনাবাহিনীর নিয়ম পরিবর্তিত হল। এখন, সেনাবাহিনীর যেকোনো পদাধিকারীরা অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ১৯৪০ সালের টোকিও অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাঁর সামনে আর কোনো বাধা রইল না। তিনি নতুন উদ্যমে অনুশীলন শুরু করে দিলেন। কিন্তু, জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় যেন তার জন্য অপেক্ষা করছিল। সেইসময় সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় গ্রেনেড বিস্ফোরণে তার ডান হাত ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। অনেক প্রচেষ্টা করেও তিনি পিস্তল ধরার 'ডান হাত' ফিরে পেলেন না। তিনি মানসিকভাবে খুবই আঘাত পেলেন। কিন্তু, তিনি হার মেনে নেওয়ার পাত্র ছিলেন না। নিজের মনকে আরো শক্ত করলেন এবং ফিরে আসার অসম লড়াই শুরু করে দিলেন। সবার অলক্ষ্যে বিধাতার দেওয়া 'বাম হাত' দিয়েই অনুশীলন শুরু করে দিলেন। ধীরে ধীরে সময়ের সাথে সাথে বাম হাতে পিস্তল ধরতে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠলেন। দেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে থাকলেন এবং সাফল্যও পেলেন। এইরকম একটি শুটার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে তিনি মাঠে উপস্থিত হতে দেখেই তাকে অন্য প্রতিযোগীরা কেউ কেউ সান্ত্বনা দিলেন। কারণ, তিনি একসময় দেশের ১নং শুটার হয়েও, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসের জন্য অনেক সাফল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ভেবে। তাঁরা প্রথমে ভেবেছিলেন যে, তিনি প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করার জন্যই হয়তো মাঠে এসেছেন। কিন্তু, কিছু সময় পর তাদের ভাবনা ভুল প্রমাণিত হল, যখন তাঁর নাম একজন প্রতিযোগী হিসাবে ঘোষিত হল। এই ঘটনায় কেউ কেউ বিদ্রুপসূচক

মন্তব্য করলেন। কিন্তু, এইসব মন্তব্য তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারল না বরং তিনি প্রতিযোগী হিসাবে খেলায় পূর্ণ মনোনিবেশ করলেন। শেষ পর্যন্ত সবাইকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে খেতাব জিতলেন। এটি সম্ভবত ১৯৩৯ সালের ঘটনা। তিনি ১৯৪০ সালের টোকিও অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু, আবারও বাধার সম্মুখীন হলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯৪০ এবং ১৯৪৪ সালের সম্ভাব্য অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হল না। তিনি নিরাশ হয়ে পড়লেন কারন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পারফরমেন্সও খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু, তিনি এবারও হাল ছাড়লেন না, বরং নিয়মিত অনুশীলন করতে থাকলেন। কবীর সুমনের গানের কথায় – 'হাল ছেড়ো না বন্ধু বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে।' অবশেষে তার স্বপ্ন সত্যি হল। ১৯৪৮ সালে লন্ডন অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি মনোনিত হলেন। মাত্র '৩৮ বছর' বয়সে ২৫ মিটার রাপিড ফায়ার পিস্তল ইভেন্টে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সেইসময়, এই ইভেন্টে আর্জেন্টিনার Carlos Valiente বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ছিলেন। তিনি এই ইভেন্টে রেকর্ড স্কোর করেছিলেন।

যাইহোক, অবশেষে অলিম্পিক খেলার দিনক্ষন আগত হল। সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি লন্ডন অলিম্পিকে ২৫ মিটার রাপিড ফায়ার পিস্তল ইভেন্টে স্বর্ণপদক জয়লাভ করলেন। তিনি একজন ডানহাতি হয়ে বামহাতে পিস্তল ধরে খেতাব জয়লাভ করেন। কথিত আছে, প্রতিযোগিতা শুরুর আগে Carlos, Karoly কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি লন্ডনে কী করতে এসেছেন? উত্তরে Karoly বলেছিলেন 'I came to learn.' প্রতিযোগিতার শেষে পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে পুরস্কার নেওয়ার সময় Karoly-কে উদ্দেশ্য করে Carlos বলেন 'You have learned enough.' শুধু তাই নয়, চার বছর পর ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিকেও ওই ইভেন্টে আবার স্বর্ণপদক জয়লাভ করেন। সেই সময় Carlos বলেছিলেন 'You have already learned a lot. It's time to retire and teach me.' কারণ, সেই ইভেন্টে Carlos চতুর্থ স্থান পেয়েছিলেন। এখানেই শেষ নয়, ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন অলিম্পিকেও দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তবে তিনি কোনো পদক জয় করতে পারেননি। যেখানে অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করার যোগ্যতাও অর্জন করা যেকোনো খেলোয়াড়ের কাছে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ, সেখানে তিনি ৪৬ বছর বয়সে অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। প্রায় ৫৬ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ৩৫ টি National championship জয়লাভ করেন। তিনি ছিলেন হাঙ্গেরিয়ান হিরো এবং একজন সফল ক্রীড়াবিদ। ১৯৭৬ সালে মাত্র ৬৫ বছর বয়সে এই মহান ক্রীড়াবিদের জীবনাবসান ঘঠে। তিনি বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন যে কীভাবে কঠোর অনুশীলন এবং লক্ষ্যে অবিচল থেকে স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করা যায়। এই লেখার ইতি টানছি তাঁরই এক বিখ্যাত উক্তি দিয়ে--'Chase Your Dreams. No Matter What Life Gives You'

In Focus

ছবির জগৎ

মঙ্গলময়ী

মুখ ও মুখোশ

মুসকান পারভিন
রসায়ন বিভাগ
পঞ্চম সেমেস্টার
Device-Realme 7i
Camera-64 MP
Al Quad camera

অঙ্কিতা দাস
রসায়ন বিভাগ
প্রাক্তন ছাত্রী
Device-POCO M3
Specation-48mp, f/1.8,
Exposer-1/100s, ISO-106,
Focal length-5mm,
Max aperture-1.67

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল

ফুলেল

ঐক্যবদ্ধ

সায়নী দিন্দা
প্রাক্তন ছাত্রী
ইংরেজি বিভাগ
Device-Samsung j6
Camera-13 MP

লিলি দাস
দর্শন বিভাগ
তৃতীয় সেমেস্টার

ফুলে ফুলে...

ফুলে ফুলে...

পূজা চানক
রসায়ন বিভাগ
তৃতীয় সেমেস্টার
Device- Galaxy a10s
Camera-13MP+2MP

পারভিন আখতার খান
রসায়ন বিভাগ
তৃতীয় সেমেস্টার
Device-POCO M2
Camera-13 MP, f/2.2,
Al Quad camera,
Focal length-3.8mm

আকাশে আজ রঙের খেলা

সৌমিতা মিশ্র
পদার্থবিদ্যা বিভাগ
তৃতীয় সেমেস্টার
Device-POCO M2 PRO
Camera-1080*1920px

মেঘ ও রৌদ্র

সায়নী দিন্দা
প্রাক্তন ছাত্রী
ইংরেজি বিভাগ
Device-Samsung j6
Camera-13 MP

আলোর গান

ঈশিতা সেনী
দর্শন বিভাগ
পঞ্চম সেমেস্টার

কী আছে পথের শেষে

পূজা চানক
রসায়ন বিভাগ
তৃতীয় সেমেস্টার
Device-Galaxy a10s
Camera-13MP+2MP

ঝরনা ঝর ঝরিয়ে

মুসকান পারভিন
রসায়ন বিভাগ
পঞ্চম সেমেস্টার
Device-Realme 7i
Camera-64 MP Al
Quad camera

দূর থেকে

রুম্পা বর্মন
প্রাক্তন ছাত্রী
বাংলা বিভাগ

PRESERVED OSTREA

শ্রেয়া মাইতি
ভূতত্ব বিভাগ
পঞ্চম সেমেস্টার
Device-Oppo A12
Camera-13MP+2MP

শেষ থেকে শুরু

পূজা চানক
রসায়ন বিভাগ
তৃতীয় সেমেস্টার
Device-Galaxy a10s
Camera-13MP+2MP

তুষারধবল

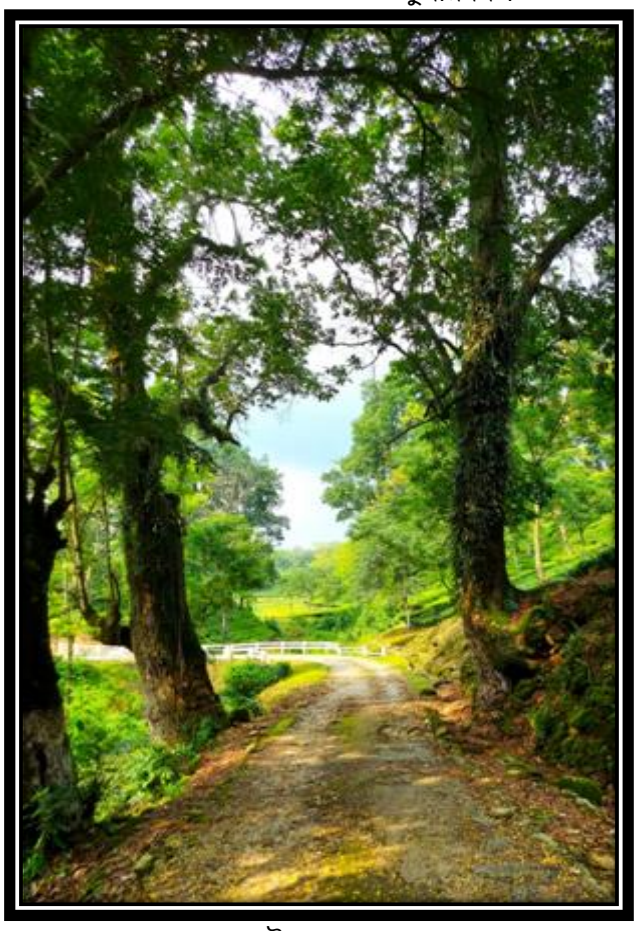

পথ চাওয়াতেই আনন্দ

সায়ন বাগ
সহকারী অধ্যাপক
পদার্থবিদ্যা বিভাগ
Device-Samsung M51
Quad camera – 64MP (F1.8) + 12MP (F2.2) + 5MP (F2.4) + 5MP (F2.4)

Colours and Quills

রেখায় - রঙে

বাঁশির সুর

সিমরান প্রামাণিক
বাংলা বিভাগ
পঞ্চম সেমেস্টার

ধূমপান মৃত্যুর কারণ

অঙ্কিতা দাস
রসায়ন বিভাগ,
প্রাক্তন ছাত্রী

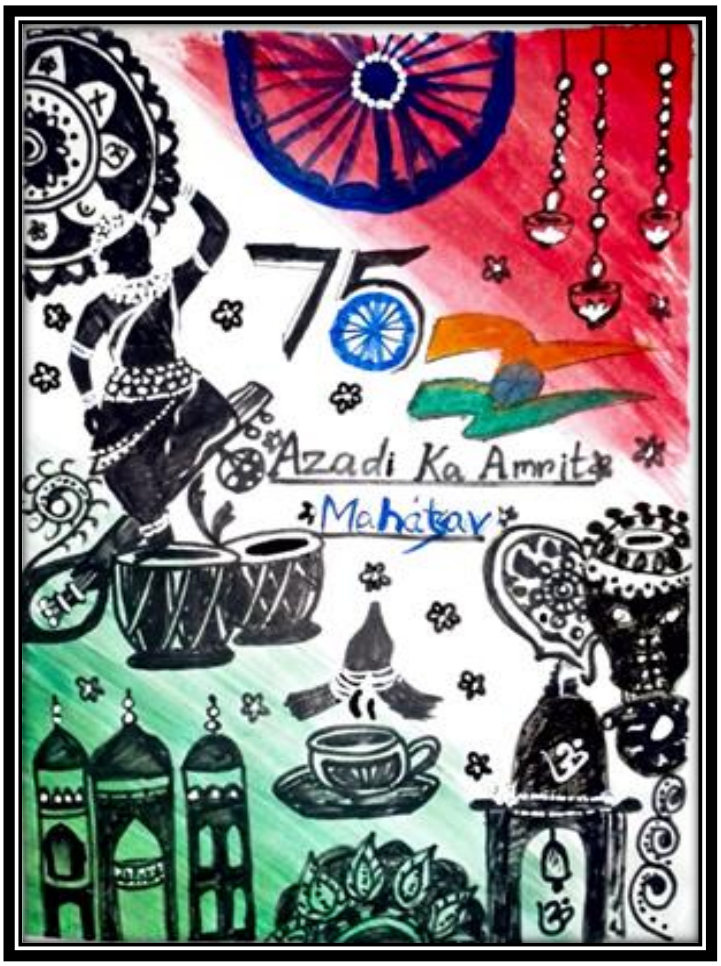

আজাদি কা অমৃত মহোৎসব

করুণা জানা
পদার্থবিদ্যা বিভাগ
পঞ্চম সেমেস্টার

রঙিন

পারমিতা মণ্ডল
বাংলা বিভাগ
তৃতীয় সেমেস্টার

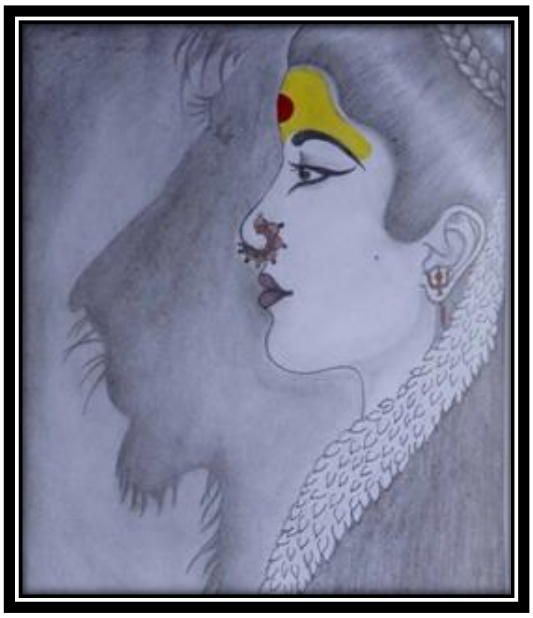

মিলি দাস,
ভূতত্ত্ব বিভাগ (প্রাক্তন ছাত্রী)

মুসকান পারভিন
রয়ায়ন বিভাগ
পঞ্চম সেমেস্টার

নদী আপন বেগে

ঘরে ফেরা

প্রকৃতি

সোনালি রাউল
রসায়ন বিভাগ, প্রাক্তন ছাত্রী

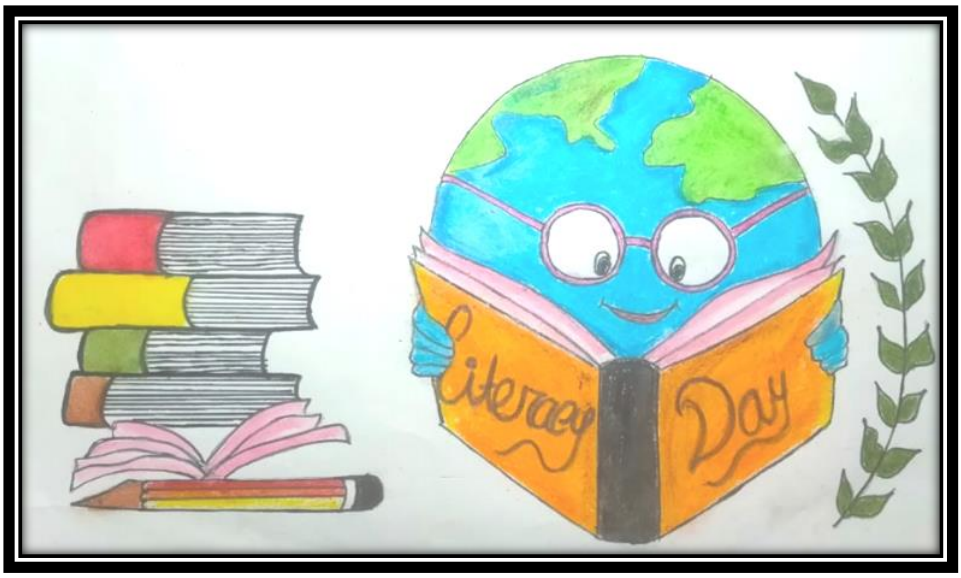

Literacy Day

প্রমী মান্না
প্রথম সেমেস্টার
গণিত বিভাগ

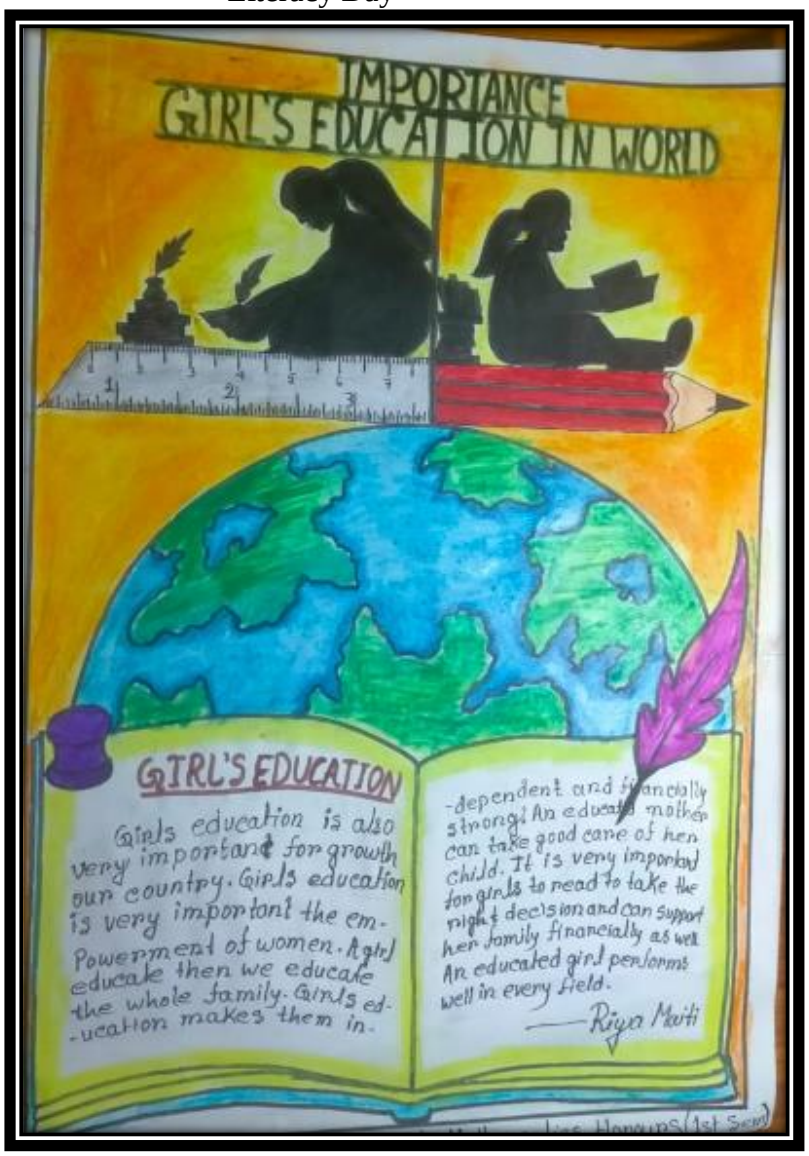

Girl's Education in World

রিয়া মাইতি
প্রথম সেমেস্টার
গণিত বিভাগ

আশ্রয়

লিলি দাস
দর্শন বিভাগ
তৃতীয় সেমেস্টার

Fun with Puzzles

শব্দ নিয়ে খেলা

শব্দছক

অপরূপা ব্যানার্জী

সহকারী অধ্যাপিকা, ভূতত্ত্ব বিভাগ

১	২		■	৩	■	৪
■		■	৫			
৬					■	
■		■		■	৭	■
৮		৯	■	১০		১১
	■	১২			■	
১৩			■		■	
	■		■	■	১৪	

পাশাপাশিঃ

১ গ্রামেজাত
৫ কর্মশালা
৬ নানাপ্রকারভুল
৮ গভীর
১০ প্রচলিতরীতিনীতি
১২ বর্শাজাতীয়অস্ত্র
১৩ উৎসাহ
১৪ ভ্রমর

উপর নীচেঃ

২ মণিদ্বারাশোভিত
৩ কারাগার
৪ একধরনেরবাঁশি
৫ অনুপস্থিতি
৭ মঞ্চ
৮ কাঙ্ক্ষিত
৯ নোনতা/ লোনা
১০ শাসনকাল
১১ বৈষ্ণবদের কপালে আঁকা তিলক

শব্দজব্দ

১)	বা	বি	ন	বে	ক	
২)	লা	কে	প	শ	ক	
৩)	জ	রা	না	রা	ঘ	
৪)	হু	বি	স	লা	ল	ব
৫)	ব	ন	ন্দি	র	জ	

Answer is on page no.: 122

উত্তরঃ

শব্দছকঃ

পাশাপাশিঃ	উপরনীচেঃ
১ গ্রামজ	২ মণিমণ্ডিত
৫ কারখানা	৩ গারদ
৬ ভ্রমপ্রমাদ	৪ সানাই
৮অতল	৫ কামাই
১০ আচার	৭ মাচা
১২ বল্লম	৯ লবণাক্ত
১৩ প্রেরণা	১০ আমল
১৪ অলি	১১ রসকলি

শব্দজব্দঃ

১)বিবেকবান, ২) কেশকলাপ, ৩) রাজঘরানা, ৪) বিলাসবহুল, ৫) নজরবন্দি

SMHGGDCW College Magazine Editorial Policy and Guidelines

Shahid Matangini Hazra Government General Degree College for Women is humbled to bring out its Annual College Magazine, 2022. Through excellent writing, design and photography, the annual Magazine is dedicated to presenting readers, the creativity of the students, teachers and other members of the college.

Operating Principles/Publication Ethics - *Previously unpublished and original works are accepted for publication in the college magazine. Selection of submissions made by contributors solely rests on the editorial board. Special consideration will be taken not to reject any submission made by college students. The magazine editors shall make every attempt to ensure that all facts and statements in the magazine content are true, that content is free of plagiarism and that the material does not infringe upon any copyright or proprietary right. The magazine will promptly acknowledge and correct factual errors. However, the magazine does not employ a fact-checker. Therefore, writers must carefully verify all facts and spellings of names.*

Submissions - *Submissions to the college magazine will be primarily made by the Principal of the college, current students of the college, faculty members of the college and office staff of the college. However, a certain quota of contributions will be made by invited contributors on the recommendation of the Principal. A certain quota of contributions will be kept reserved for the alumni of the college.*

Content - *In keeping with the college being a Woman's Government College located at Nimtouri, Purba Medinipur, the magazine will strive to reflect significant diversity in its content, including the following:*

1. *Magazine content in each issue should include a variety of issues specifically women's varied concerns in society.*
2. *Notwithstanding the creativity of the content, the aim of the college magazine is also to highlight subjects, specific to female adolescent health (both mental and physical)*
3. *Creative categories like puzzles, crosswords, travelogues, interview transcripts and others will always be encouraged*

Format and Visual Elements - *Generally, pages are laid out using 400 words a page Specific word counts are available for specific sections-Short Stories-within 1000 words, Academic Essays/Articles/Interview Transcripts-within 1500 words, Poems-maximum 50 lines. Photographs and sketches are a vital portion of the magazine. Intriguing photos and sketches are critical and are restricted to ones that are highly engaging and look candid. Captions of the photographs/sketches/articles should work to pull readers into a story or image. We expect captions to be more than labels and prefer for them to offer information and insight into the photograph/sketch/article. Special attention will always be paid to high-quality paper and printing.*

সৃজনী

তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষ